বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ

সিন্দাবাদ প্রকাশনী

বায়তুল মোকাররম—ঢাকা

www.pathagar.com

BANGLADESH ! MY BANGLADESH !!

By Prof. Abul Kalam Azad

প্রকাশক :

মুহাম্মাদ আবদুস সালাম রেজা

সিন্দাবাদ প্রকাশনী

১৩, পুস্তক বিপনী, বায়তুল মোকাররম—ঢাকা—২

প্রথম সংস্করণ : মে, ১৯৮৩

মূল্য : ১১'০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে : প্রবাল প্রিন্টিং প্রেস

১৪, র‍্যাংকিন স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা—২

www.pathagar.com

সূচী পত্র

- বাংলাদেশ ! আমার বাংলাদেশ !! — মন্তব্য
  ডঃ কে. এম. মোহসিন
  (Bangladesh ! My Bangladesh !!—Comment
  Dr. K. M. Mohsin)
- ভূমিকা : ডঃ এমাজুদ্দিন আহমদ
  (Preface : Dr. Emajuddin Ahmed)
- আমার কথা
  (My Statement)
- প্রকাশকের কথা
  (Statement of the Publisher)

অধ্যায় — Chapter		পৃঃ
১ ।	খনিজ সম্পদ (Mineral Resources)	১৭
২ ।	কৃষিজ সম্পদ (Agricultural Resources)	৩১
৩ ।	বনজ সম্পদ (Foresteries)	৪৪
৪ ।	বাংলাদেশের অবস্থানের অর্থনৈতিক সুবিধা (Economic facility of geographical situation of Bangladesh)	৫০
৫ ।	পানি সম্পদ (Water Resources)	৫৩
৬ ।	ফারাক্কা ও বাংলাদেশের পানি সম্পদ (Farakka and water resources of Bangladesh)	৫৬
৭ ।	সংযোগ খাল ও তার প্রতিক্রিয়া (Link-Canal and it's affect)	৬০
৮ ।	ভূ-গর্ভস্থঃ ও লোনা পানি (Under ground and Saline water)	৬৬

www.pathagar.com

৯। মৎস্য সম্পদ ৬৭
(Fisheries)

১০। পানি সম্পদ ও আমাদের রাজনীতি ৭৫
(Water resources and our politics)

১১। জন সম্পদ ৮৪
(Human Resources)

১২। বাংগালীর রণ কৌশলের সমাজতাত্ত্বিক পর্য্যালোচনা ৯২
(A Sociological discussion of the defence tactics of the Bangalies)

১৩। বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ১০১
(Social structure of Bangladesh)

১৪। চাকমা উপজাতি-সমস্যা প্রসঙ্গে ১২০
(About the problem of the Chakma tribe)

১৫। বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর সাম্প্রতিক পরিবর্তন ১২৮
(Recent change in the social structure of Bangladesh)

১৬। ঢাকা জেলায় লোহার খনি ১৩৬
(Iron mine in Dhaka)

১৭। তবুও কেন এত দারিদ্র? ১৩৮
(Why so much poverty?)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ! আমার বাংলাদেশ !!—মন্তব্য

আবুল কালাম আযাদের "বাংলাদেশ ! আমার বাংলাদেশ !" বই সম্পর্কে আমি কেন লিখছি ? এ লেখারও একটি পূর্ব কথা আছে। ৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, খুব সম্ভব আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র লীগের কর্মী হিসাবে দেশের তৎকালীন রাজনীতির সাথে জড়িত থাকা অবস্থায় "পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য" ও "সংগ্রামী বাংলা" শিরোনামে দুইটি বই প্রকাশ করেন। আরো কয়েকটি পুস্তিকার সাথে বই দুখানি আমাকে পড়তে দেন। যেহেতু সংগ্রামী বাংলায় বাংলাদেশের ইতিহাসের উপর কিছু বক্তব্য ছিল, তাই ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে আমার মতামত দেবার অনুরোধ জানান। এরপর দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। গণ আন্দোলন, আইয়ুব খানের পতন, ইয়াহিয়া খানের উত্থান, নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ। যে কারণেই হোক, লেখকের সাথে কয়েক বৎসর আর কোন যোগাযোগ হয় নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য কোথাও কোন কপি না পেয়ে, প্রায় আট বৎসর আগে দেওয়া সংগ্রামী বাংলা সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেন। দীর্ঘদিন পর বই খানি আমার কাছ থেকে পাওয়ার কৃতজ্ঞতাই সম্ভবতঃ বর্তমান বই সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করেন। লেখক "স্বাধীন, সমৃদ্ধ ও সম্মানিত বাংলাদেশের" স্বপ্ন দেখেছেন এবং অনেকের মতই এইরূপ একটি বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেন। তাই এ বইতে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ ও উহাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন এবং বিশ্বাস করেন যে, আভ্যন্তরীণ সম্পদের সুপরিকল্পিত ও 'যথাযথ' ব্যবহারের মাধ্যমে একটি "সমৃদ্ধ-সুখী ও সম্মানিত বাংলাদেশ" গড়া সম্ভব।

বস্তুত পক্ষে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশের জনসাধারণ যখন স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত, তখন অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে,

www.pathagar.com

পাকিস্তানের কৃষি প্রধান বাংলাদেশ অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকতে পারবে কিনা? ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলকে যেভাবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সত্বা হিসাবে নেতৃবৃন্দ কল্পনা করেছেন, তা থেকে তৈল ও কলকারখানা সমৃদ্ধ আসাম ও পশ্চিম বাংলা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান আমলের শোষণ ও বঞ্চনা, অসম অগ্রগতি, বাংলাদেশ অঞ্চলের অনগ্রসরতা এবং পশ্চিমাঞ্চলের উপর এর অর্থনৈতিক নির্ভরশীল নীতির ফলে, ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশের টিকে থাকার প্রশ্নটি স্বাভাবিক কারণেই দেশে বিদেশে রাজনৈতিক কর্মী ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মনে জাগে। স্বাধীনতার মানসিক ও মানবিক দিক ছাড়াও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু অর্থনীতিবিদ সুখী, অর্থবহ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা নিজস্ব সম্পদ ছাড়াও বিদেশী সাহায্য, ঋণ ও বিদেশে অর্জিত টাকা পয়সার সুষ্ঠ ব্যবহারের দিকে জোর দিয়েছেন। তাছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে এর রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। সে সময় এসব মতামত কেউই অগ্রাহ্য করতে পারেনি বরং জন সাধারণের মনে উৎসাহই জুগিয়েছে। ষাটের দশকে দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদা **পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্ভাবনা** নামক পুস্তিকায় এ অঞ্চলের শিল্প সমৃদ্ধির উজ্জল পথ নির্দেশ করেন। এরও বহু আগে, বিভাগের প্রাক্কালে, স্বাধীন সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলার পরিকল্পনা ও প্রয়াস ব্যর্থ হলে, হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি পূর্ব বাংলা ও আসামের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত প্রদেশ ও এর অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে সক্ষম বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসাধারনও আশা করেন যে, যুদ্ধকালীন চেতনা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশ গড়তে হবে।—দেশ উন্নত, সমৃদ্ধ এবং বিশ্বে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু স্বাধীনতার এক দশকেরও অধিক কাল পরও জনসাধারণের আশা পূর্ণ হয়নি। বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হয়নি। এবং মর্যাদার আসন পায়নি। আজও বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দু/তিনটি দেশের অন্যতম। যারা আশাবাদী ছিলেন তাদের অনেকেই নিরাশ হয়েছেন এবং অনিশ্চিত

www.pathagar.com

ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন। কেউ আবার ভস্মাবহ দিনের স্বপ্ন দেখছেন। কেউ কেউ এখনও আশায় বুক বেধে আছেন। আবুল কালাম আযাদ তাঁদের একজন।

সম্ভবতঃ দেশের জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা, কর্ম-প্রেরণা ও নব উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য, বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ!! গ্রন্থে নতুন করে দেশের সম্পদ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। খনিজ, কৃষিজ, বনজ, পানি, মৎস্য ও জন সম্পদ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অগ্রগতির দিক্ নির্দেশ করেছেন। অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামো আলোচনা করেছেন। বইতে রাজনীতির গন্ধ আছে। কিছু নতুন কথা ও জোরালো বক্তব্য আছে। সব সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ লেখকের বক্তব্যের সাথে একমত হবেন, এমন আশা করা ঠিক নয়। **তবে লেখকের সৎসাহস ও দেশপ্রেম নিয়ে সম্ভবতঃ কোন দ্বিমতের অবকাশ নাই।** সর্বোপরি বইতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য দুঃসময়ে সুদিনের, নৈরাশ্যের মধ্যে আশার ও দারিদ্রের মধ্যে সমৃদ্ধির আভাষ আছে।

ডঃ কে. এম. মোহসীন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
সাবেক সাধারণ সম্পাদক:
বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি।

তাং— ২২।৫।৮৩

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

"বাংলাদেশ! আমার আমার বাংলাদেশ !!" কথাটি বড়ই মায়া-ময় ও তাৎপর্য্য পূর্ণ। এর মধ্যে "আমার" শব্দটি একান্ত নিজের। নিজের দেশকে ভালোবাসেনা এবং মাতৃভুমির কথা মনে পড়লে, একটু আবেগ-অনুভূতির উদ্রেক হয়না, এমন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মক্কা ত্যাগ কালে সজল নয়নে বলেছিলেন, "আয়ে মক্কা আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তোমার অধিবাসীগণ আমার উপর জুলুম করে তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে"। যারা নিতান্ত দয়ামায়াহীন পাষন্ড, তারাই নিজের জাতীয়স্বার্থ, স্বার্থ-স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে বিক্রী করতে পারে।

আজকের বিশ্বে "জোর যার মুলুক তার" নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই দুর্বল জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নটি বড়ই নাজুক হয়ে পড়েছে। ১৯৭১ সালে যারা জান-বাজি রেখে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে, তাদের কেউ কেউ আজ বিদেশীদের নিকট বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিকানোর মত কাজ করছেন। আবার মুক্তি যোদ্ধাদের ভাষায়, যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল, তাদের অনেকেই আজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জান কোরবান করতেও প্রস্তুত।

একারণেই, একজন ধর্মীয় পুস্তকের প্রকাশক হওয়া সত্ত্বেও, অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদের "বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ !!' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করলাম। আমি জানি অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ একজন মুক্তি যোদ্ধা এবং তাঁর বর্তমান গ্রন্থ ধর্ম সম্পর্কিত নয়। তবুও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে কোন সৎ ও দেশ প্রেমিক নাগরিকের কোনরূপ দ্বিমত নেই। দেশপ্রেমের তাগিদেই আমি "বাংলাদেশ"! আমার বাংলাদেশ !!" গ্রন্থ খানি প্রকাশ করলাম। বইটি পড়ে যদি পাঠকের মনের হতাশা দূরীভূত হয়ে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠে তবেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে।

মোহাম্মাদ আবদুস সালাম

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিভিন্ন মহল বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ বলেছেন বাংলাদেশ দারিদ্রের অতল গহ্বর। কেউবা বলেছেন বাংলাদেশ হল সম্পদহীন এক ভূখণ্ডে সীমাহীন জনসমষ্টির অসুস্থ বিচরণ ক্ষেত্র। কারো মতে গুমট আবহাওয়ায় বাষ্পস্নাত রোগগ্রস্থ দুর্বল মানুষের আবাসভূমি এই বাংলাদেশ। সবচেয়ে করুন ও অসম্মানজনক চিত্র এঁকেছেন আমেরিকান কুটনীতিবিদ। তাঁর মতে, বাংলাদেশ একটি "তলাবিহীন ঝুড়ির" মত। সবার কথা শুনতে শুনতে সকলে প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছে, বাংলাদেশ হল অনাহার ও অপুষ্টির এক দেশ। কোন সম্ভাবনাহীন জরা, ব্যধি ও দারিদ্রের দেশ। আমার প্রিয় সহকর্মী অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এক ব্যতিক্রম। তিনি বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এবং মাটি, পানি, মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট বিশেলষণ করে জোরে সোরে ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ দরিদ্র নয়। দরিদ্র এর নেতৃত্বে আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। এ সত্য উদঘাটনের জন্য তাঁর শ্রম ও উদ্যোগ অভিন্দন যোগ্য।

এই ক্ষুদ্রাকার বই-এ তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ রাজীর বর্ণনা দিয়েছেন আর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে এসব সম্পদের যথাযোগ্য সমাযোজন (Mobilisation) সম্পন্ন হ'লে বাংলাদেশ বিশ্বের এক সম্পদশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। তাঁর নিজের কথায়, "আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি আমাদের কোন কিছুর অভাব নেই। শুধু সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের অভাবই আমাদের সকল দারিদ্র ও দুর্দশার কারণ।"

বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক অত্যন্ত যত্নসহকারে আর প্রমাণ্য উদ্ধৃতি দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন বাংলাদেশের খনিজ, কৃষিজ, বনজ, মৎস্য, পানি ও জনসম্পদের অবয়ব আর প্রশ্ন তুলেছেন এ সম্পদ যে দেশে বিদ্যমান, সে দেশ কিভাবে দরিদ্র হতে পারে? সাধারণ বিশ্বাস এ দেশে কোন খনিজ সম্পদ নেই। কিন্তু সহজে যেভাবে গ্যাসের মত

www.pathagar.com

মূল্যবান সম্পদ আমাদের করায়ত্ব হয়েছে, লেখকের মতে, একটু পরিশ্রম করলে অন্যান্য অনেক খনিজ সম্পদেরও দেখা মিলতে পারে বাংলাদেশে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে সনাতন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে এদেশ যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। বহু দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকও এমত পোষণ করেন। এদেশের মাটি এত উর্বর যে, এখানকার পানি সম্পদকে কাজে লাগালে, কৃষিজ ও বনজ সম্পদের যথাযোগ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করলে আর জনসমষ্টিকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করলে এ দরিদ্রতম দেশটিও একটি সম্পদশালী দেশে রূপান্তরিত হবে। লেখক আবুল কালাম আযাদ এ সত্যটি অত্যান্ত সুস্পষ্টভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে এদিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, পানি সম্পদে বাংগালীদের জীবনীশক্তি নিহিত। তার অপচয় ঘটলে অথবা তার উৎস নির্মূল হলে এদেশের সমূহ বিপদ।

তাই তিনি বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন, এদেশের জনসাধারণ, বিশেষ করে শাসনকারী 'এলিটদের' এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। রাজনীতি যদি সমস্যা সমাধানের কৌশল হয় তবে এদেশের রাজনীতির চরিত্র হওয়া উচিত উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ আর এদেশের জীবনশক্তি তুল্য পানি সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ। পাশ্চাত্যে যেমন বাজার কুটনীতি অথবা মধ্যপ্রাচ্যে যেমন তেল কুটনীতি, বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনবোধে তেমনি পানি কুটনীতির জন্ম হওয়া উচিত। ভারত আমাদের মহান প্রতিবেশী। কিন্তু গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে, বিশেষ করে সংযোগ খাল সংক্রান্ত প্রশ্নে যেসব জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে তা মুল্যায়ন করে আর বাংলাদেশের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থেকে এর সমাধান আনয়ন যেমন বাংলাদেশের জন্য কাম্য, তেমনি বাঞ্চিত ভারতের জন্যও।

কিন্তু সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, এ লক্ষ্যে অগ্রসর হবার জন্য প্রতি পদক্ষেপে আমরা হোচট খাচ্ছি। এত সম্পদ থেকেও বাংলাদেশ উত্তরোত্তর দারিদ্রের অভিশাপে অভিশপ্ত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক তার সমাজতাত্ত্বিক পটভূমির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেশের দারিদ্রের মূলে রয়েছে দেশের অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত রাজনীতি ও প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা। রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতির মূল্যবোধ বর্জিত নীতির অনুসরণ প্রশাসনিক

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে জনগণের অংশ গ্রহণের অনুপস্থিতি ; আর শিক্ষাক্ষেত্রে অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচীর উপস্থিতি এসবই তাঁর ব্যাখ্যা।

অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ ক্ষুদ্র পরিসরে যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার চেয়ে বৃহত্তর আলোচনা ক্ষেত্রের সূচনা করেছেন। এই বৃহত্তর ক্ষেত্রটি বিভিন্ন গুণীজনের আলোচনা, পর্যালোচনার মনিকাঞ্চন ভরে উঠলেই তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে। লেখকের এ শুভ প্রচেষ্টাকে আবারও জানাই অভিনন্দন।

ঢাঃ বিঃ ২১/৫/৮৩

ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক,
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
এবং
প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

আমার কথা

আমি পেশাজীবি লেখক নই। তবে আমার আজীবনের পেশা অধ্যাপনা করতে গিয়ে জ্ঞান সাধনা রাজ্যের প্রজা হতে হয়েছে। জ্ঞানান্বেষণেই আমি যোগ্য ব্যক্তি—জ্ঞান দানে নয়। তবুও ইতিমধ্যে আমার বেশ কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমার রচিত প্রতিটি পুস্তক-পুস্তিকা বা প্রবন্ধের একটি করে পটভূমিকা রয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ "বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ!!" রচনা ও প্রকাশনারও একটি পটভূমি আছে।

১। আমার ছাত্র জীবন কেটেছে সংগ্রাম ও কারাগারে। সেই শিশুকাল হতেই মানুষের অহেতুক ও অন্যায্য দুঃখ কষ্ট মনকে মারাত্মকভাবে পীড়িত করতো। দুর্বলের উপর শক্তিমানের অত্যাচার মনকে ক্ষুব্ধ করতো। যশোর সেনানিবাসের নিকটে মনোহরপুর জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। সেই ১৯৫৪/৫৫ সালের কথা। সে সময়ে মাঝে মাঝে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর লোকেরা গ্রামবাসীদের গাছ হতে ডাব, মিষ্টি আম ও অন্যান্য ফল পেড়ে নিয়ে যেতো। আমি প্রতিবাদ করতাম। খাঁন সেনাদের অন্যায় কাজকে তাদের সামনেই তুলে ধরতাম। কখনো কখনো উর্দ্ধতন কর্ম কর্তাদের কাছে নালিশ করতাম। আমার এস্বভাবের জন্য গরীব-দুঃখী-অসহায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আমি যেমন আদরের হয়ে উঠেছিলাম, তেমনি খাঁন সেনাদের চোখের বিষ হয়েছিলাম। এ কারণে আমাকে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে, কিন্তু কখনো স্বভাব ত্যাগ করতে পারিনি। বয়স বৃদ্ধির সাথে আমার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি, তবে কর্মক্ষেত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ স্বভাবের কারণে জীবনে কখন কৈশর আর কখন যৌবন এসেছে, টের পাইনি।

জীবনে যখন যে অবস্থায় ছিলাম, আমার মাতৃভূমিকে জানার চেষ্টা করেছি। জানার চেষ্টা করেছি তার সম্পদ ও শক্তিকে—বুঝার চেষ্টা করেছি তার দারিদ্র ও সমস্যাকে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত্বা ও স্বল্প জ্ঞানেই অনুভব করেছি, ইতিহাসের আদিকাল হতেই বাংলাদেশ

www.pathagar.com

শোষিত হয়েছে। নির্যাতীত ও শোষিত বাংগালী জাতি যদি একবার স্বাধীনতা পায়, নিজের সম্পদের মালিক হয়, তবে এ জাতির মত সম্পদশালী ও সুখী জাতি বিশ্ব সমাজে খুব কমই হবে। এ অনুভব হতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন ও সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করি। সে পর্য্যায়েও আমি আমার জ্ঞান ও চিন্তাকে লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

অবশেষে যেভাবেই হোক আমাদের হাজার বছরের কাম্য স্বাধীনতা এসেছে। অনেক আশায় ও আনন্দে হৃদয় আমার উদ্বেলিত হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের পর, ১৯ শে ডিসেম্বর মুজিব নগরে গিয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের ২রা মে তারিখে রনাঙ্গণের উদ্দেশ্যে মুজিব নগর ত্যাগ করার পর ইতিমধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও বাংলাদেশ বা রনাঙ্গণ ত্যাগ করিনি। ১৯৭১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭ টায় মুজিব নগরে অবস্থিত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে এক বক্তৃতায় আমি আমার অন্তরের গভীর আশার কথাই ব্যক্ত করেছিলাম।

২। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন যেন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। আমাদের চির ঘৃণার বস্তু 'অস্ত্র মহড়া' আমাদেরই সহকর্মী ও বন্ধু বান্ধবেরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে চালিয়ে গেল। কেহই বলল না যে, আমরা বিদেশী শাসকদের এ কৌশলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি। অস্ত্রের ঝন ঝনানি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি হয়ে দাড়ালো। অস্ত্রের গর্জনে যুক্তির কন্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল।

দেখলাম, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। দেখলাম, অসাহায়ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্নাভাবে মারা গেল। আর যারা এতদিন বাংগালীর মুখে অন্ন যোগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে জোর প্রচার চালিয়েছে, তারা দায়িত্ব পেয়ে এই মহা দুর্ভীক্ষে নির্বিকার হয়ে রইলো।

দেখলাম, রাষ্ট্রীয় ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির সার্বিক খবরদারী। জলপাই রংয়ের পোষাকে 'রক্ষি বাহিনী'র সদম্ভ পদচারনা আর বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর প্রতি বিমাতা সুলভ ব্যবহার।

দেখলাম, গঙ্গা নদীকে দ্বিজাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে আল্লাহ্‌র কাছে শোকর আদায়ের আত্ম তৃপ্তি।

www.pathagar.com

দেখলাম, হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য ও তার তাৎক্ষনিক হাওয়া হয়ে যাওয়া। পাটের গুদামে আগুন লাগা ও দোষী ব্যক্তিদের সদম্ভ মুক্ত পদচারনা। লম্বা চুলোদের ব্যাংক লুট ও দ্বিধাহীনভাবে অবাধে সমাজে বিচরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা সর্বত্র চরম বিশৃংখলা আর লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা।

সর্বশেষে দেখলাম, মানুষের মনের সন্দেহ, "বাংলাদেশ কি টিকবে" ?

(৩) বাংলাদেশের রাজনৈতিক অভিজাতদের চরম ব্যর্থতার কারণে, যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে সুযোগে একদল লোক অতি কৌশলে প্রচার শুরু করল, বাংলাদেশ টিকতে পারে না। কারণ একটি স্বাধীন দেশ রূপে টিকে থাকার মত প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগলিক অবস্থান এবং সর্বোপরি মানবিক যোগ্যতা কোনটাই বাংলাদেশের নেই। সুতরাং বাংলাদেশকে টিকতে হলে, অন্তত ভারতের আশ্রিত রাজ্য হিসাবেই টিকতে হবে। এ প্রচার সম্পর্কে কার কি মনোভাব জানি না। তবে আমি এ ধরনের প্রচারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকি। কারণ, ৫০ দশকে একদল লোক পাকিস্তানের স্থায়িত্বের যোগ্যতা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন তুলতো। তখন কেউ এর গুরুত্ব দিত না। পরবর্তী কালে এ প্রচারের প্রতিক্রিয়া আমরা সবাই দেখেছি। ঠিক একই উদ্দেশ্যে, কিন্তু নতুন কৌশলে বাংলাদেশের যোগ্যতা নিয়ে প্রচারনা চালানো হচ্ছে। আমরা, এ যুগের মানুষেরা, যদি এ প্রচারনাকে হালকাভাবে নেই, তবে মস্ত ভুল করব বলে আমার বিশ্বাস।

আমার মনে হয় যারা এসব প্রচারনায় সাহায্য করে থাকেন, অনেকে এর সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া না ভেবেই করেন। আবার কেউ কেউ অজ্ঞানতার কারণে করেন। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও এদের মধ্যে দু-একজন আছেন, যারা সব কিছু বুঝে শুনেই করে থাকেন।

যারা আমাদের জাতীয় চিন্তা রাজ্যে হতাশার জন্ম দিচ্ছেন, তাদের সকলকেই বুঝতে হবে যে, তারা দেশের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর কাজটি করছেন। কারণ, বেঁচে থাকার সকল যোগ্যতা থাকা সত্বেও, বেঁচে থাকার ইচ্ছা না থাকলে কেউ বাঁচতে পারে না। ব্যক্তি বা জাতীয় জীবনে হতাশা আর মৃত্যু-দূত একই কথা।

৪। আমরা যারা বুদ্ধিজীবীরূপে পরিচয় দিয়ে থাকি, তাদের প্রধান কর্তব্য হলো জাতীয় হতাশা দূর করা। জাতিকে তার সম্পদ

www.pathagar.com

ও সমস্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা। সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া।

বিদেশীদের কূট কৌশল ও জাতীয় শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থতার কারণে হতাশা গ্রস্থ জাতিকে হতাশমুক্ত করা ও আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান করা বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাজ। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি এ মহান দায়িত্ব পালনের কোন যোগ্যতাই রাখে না।

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, চারিদিকে "নাই" আর "নাই" য়ের শিঙ্গা ধ্বনি শুনছি। সরকার বিদেশ গিয়ে বলে "নাই"। জনগণ সরকারের কাছে গিয়ে বলে "নাই"।

পণ্ডিতগণ বলেন, সমাজে শতকরা দশজন জন্মগতভাবে সৎ ও শতকরা দশজন জন্মগতভাবে অসৎরূপে জন্মগ্রহণ করে থাকে। বাকী আশি ভাগ "নিরপেক্ষ" জনতা। সৎ দশভাগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলে "নিরপেক্ষ জনতা" তার সাথে যোগ দেয়। সর্বত্রই সৎ লোকের সাক্ষাৎ মিলে। আবার অসৎ দশভাগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলে "নিরপেক্ষ জনতা" তার সাথে যোগ দেয়। সর্বত্রই অসতের ছড়াছড়ি পড়ে যায়।

কোন ব্যক্তি বা জাতির বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ হলো "আমি বাঁচবই। বেঁচে থাকার যোগ্যতা আমার আছে।" এমন একটি সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস। একবার এ বিশ্বাস জাগ্রত হলে দেখা যাবে বেঁচে থাকার মত অনেক উপকরণ ও সম্পদ হাতের কাছেই রয়েছে। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের বেঁচে থাকার যোগ্যতা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি।

প্রাথমিক শিক্ষকদের সভাপতিরূপে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার ও সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ আমার হয়েছে। আমি এ সুযোগকে আমার জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। জানার চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে। বুঝার চেষ্টা করেছি বাংগালী জাতির মানবিক যোগ্যতাকে।

আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থখানায় আমার অভিজ্ঞতা ও অভিমত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি জানি, অনেকই আছেন, যারা আমার সামালোচনায় মুখর থাকবেন, ষড়যন্ত্রে তৎপর হবেন।

www.pathagar.com

আমার শ্রম ও স্বপ্ন তখনি সার্থক হবে, যখন দেখবো বাংগালী জাতি বজ্রকণ্ঠে বলছে "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ? ভয় নাই ওরে ভয় নাই।"

২৪শে মে, ১৯৮৩

আবুল কালাম আযাদ
সহকারী অধ্যাপক,
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫০/ই, বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টাফ কোয়ার্টার ঢাকা

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ! আমার বাংলাদেশ !!

বাংলাদেশ ! আমার জন্মভূমি। আমার পিতা, পিতামহ, আমার স্ত্রী পুত্র-কন্যা ও উত্তর পুরুষদের অধিষ্ঠানের স্থান। এদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমিও অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলাম। স্বপ্ন দেখেছি—আজো স্বপ্ন দেখি—স্বাধীন, সমৃদ্ধ ও সম্মানিত বাংলাদেশের।

১৯৭১ সালের পূর্বে আমাদের যে বিশ্বাস ছিল, বাংলাদেশ একটি সম্পদশালী দেশ। শুধুমাত্র বিদেশী শোষণ ও দুঃশাসনের কারণেই এদেশ দরিদ্র রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এ বিশ্বাস কি অবাস্তব ও কাল্পনিক ছিল ? স্বাধীনতা-উত্তর এক যুগের অবস্থা দর্শনে তা মনে হয় না কি ? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বাংলাদেশ সত্যিই একটি সম্পদশালী দেশ।

একটি দেশের দু'টি সম্পদ থাকে—প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ। এ দু'টি সম্পদে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের তো বটেই, পৃথিবীর বহুদেশ হতে অনেক বেশী সম্পদশালী। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় এ সত্য প্রমাণিত হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ তিন প্রকারের হয়। খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ ও পানি সম্পদ।

খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশে কি প্রকার ও পরিমাণের খনিজ সম্পদ আছে তা আলোচনা করা যাক। এটা সর্বজন বিদিত যে, বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। কিন্তু কি পরিমাণ গ্যাস আছে তা আজো সঠিক ভাবে জানা যায়নি। আমাদের একজন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশ গ্যাসের উপর ভাসছে। অবস্থার বিশ্লেষণে মন্তব্যটিকে অতিউক্তি রূপে বর্ণনা করা যায় না। বাংলাদেশে যত সহজে গ্যাস ডিপোজিট আবিষ্কৃত হচ্ছে পৃথিবীর খুব কম দেশেই তা হয়েছে। গত কয়েক যুগের হিসাব পরীক্ষা করলে দেখা যায়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে প্রতি বৎসর গড়ে মাত্র একটি করে সন্ধানী কূপ খনন করা হয়েছে। এত স্বল্প সংখ্যক কূপ খনন করেই যে ফল লাভ হয়েছে তা পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখা গেছে। বাংলাদেশে খনিতো প্রতি তিনটি কূপের মধ্যে একটিতে গ্যাস পাওয়া গেছে। আর পৃথিবীর ফল লাভের সাধারণ হার হলো দশটি খননে একটি। অর্থাৎ বাংলাদেশে খননের ফল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় তিন গুণেরও বেশী লাভজনক। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত ১১টি গ্যাস খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সব গ্যাস খনিতে নিশ্চিতভাবে ১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া গেছে (chief geologist, Exploration unit Petro bangla : proceedings of the 14th Annual Conf, 1978 Bangladesh Geological Society, p 71)। প্রকৃতপক্ষে বাংলা-দেশের সর্বত্রই গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা প্রায় সংবাদ পত্রে দেখি যে, নলকূপ বসাতে গিয়ে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এভাবে বাংলাদেশে কত সংখ্যক সম্ভাবনাময় গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তা আমাদের কেহই মনে রাখেনা। হঠাৎ করে প্রকাশিত গ্যাস ক্ষেত্রগুলি যদি সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করা হতো, তবে এতোদিনে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাপ দ্বিগুণেরও বেশী হয়ে যেত।

আজকের বিশ্বে গ্যাসের ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক মূল্য পেট্রোলের চেয়েও অনেক বেশী ও বহুমুখী। গ্যাস দিয়ে সার পোশাক পরিচ্ছদ, ওষুধ, পেট্রোল প্রভৃতি তৈরী করা যায়। তাছাড়া বাংলাদেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্যাস পৃথিবীর কম দেশেই পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের গ্যাসে কমপক্ষে শতকরা ৯৫ ভাগ মিথেন রয়েছে। এ গ্যাস খনি হতে সরা-সরি রান্না ঘরে প্রেরণ করা যায়। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের আর কোন দেশের গ্যাস এত মিথেন সমৃদ্ধ নয়। অন্যান্য দেশের গ্যাস খনি হতে উত্তোলনের পর ব্যয় বহুল পন্থায় জ্বালানীযোগ্য করে ব্যবহার করতে হয়। এতে অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াও উত্তোলিত গ্যাসের শতকরা ২৫ ভাগ অপচয় হয়। কিন্তু বাংলাদেশের গ্যাসকে জ্বালানীযোগ্য করার জন্য কোন প্রক্রিয়াজাত করতে হয় না। ফলে উত্তোলিত গ্যাসের কোন অপচয় হয় না। এর সবটুকু সরাসরি ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া বাংলাদেশের গ্যাসে উপজাত রূপে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। কৈলাসটিলার কূপের এক লক্ষ ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করলে এক ব্যারেল ও বিয়ানী বাজারের একই পরিমাণের গ্যাসে দুই ব্যারেল পেট্রোল উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়, যা গ্যাসের ইতিহাসে সত্যিই বিস্ময়কর (M. A. Maroof Khan : Oil prospect in Bangladesh, Paper presented in the seminar on—Petroleum Exploration in Bangladesh 1982)।

বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশে কমপক্ষে ১২ ট্রিলিয়ন গ্যাস নিশ্চিত ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এ হিসাব কিভাবে করা হয়েছে ? গ্যাস বা তৈল আবিষ্কারের জন্য যে কূপ খনন করা হয়েছে সেই কূপকেই বর্তমানে উৎপাদক কূপ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এবং সিসমোগ্রাফিক পরীক্ষার মাধ্যমে আশ-পাশের কিছু অঞ্চলকে গ্যাস ক্ষেত্ররূপে বিবেচনা করে বর্তমান গ্যাসের মজুদ নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারণ ও সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবিষ্কৃত ক্ষেত্রে কয়েকটি কূপ খনন করা। অর্থের অভাবে ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে কূপ খননের লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রতিটি আবিষ্কৃত ক্ষেত্রে একটি করেই সন্ধানীকূপকে উৎপাদক কূপরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মজুদ গ্যাস সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে বাংলাদেশে আবিষ্কৃত ক্ষেত্রেই গ্যাসের মজুদ ১২ ট্রিলিয়ন হতে কয়েকগুণ বেশী। কেহ কেহ এর পরিমাণ ৫ গুণ বেশী হবে বলে মনে করেন। যাক এসব হলো অনুমানের কথা। কিন্তু এটা সত্য যে সঠিকভাবে জরিপ করলে প্রতিটি গ্যাস ক্ষেত্রেই মজুদের পরিমাণ বর্তমান পরিমাণ হতে অনেক বেশী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পেট্রোল অপেক্ষা গ্যাসের মূল্য অনেক বেশী। গ্যাসকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা আর এর অপচয় করা একই কথা। উন্নত দেশ সমূহে পেট্রো-কেমিক্যালস স্থাপনার মাধ্যমে গ্যাস থেকে অনেক বেশী অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করছে। আমরা গ্যাস দিয়ে মূল্যবান ওষুধ, পরিচ্ছদ, সার প্রস্তুত করে অনেক বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারি।

বর্তমানে বাংলাদেশে দৈনিক ২০ লক্ষ ১০ হাজার ঘনফুট গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। এর সিংহভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে নিছক জ্বালানীরূপে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক বাজার দরে এর ফলে বাংলাদেশের বছরে ৮ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বাচছে। বাখরাবাদ গ্যাস ভিত্তিক বর্তমানে চট্টগ্রামে নির্মীয়মান সার কারখানা দুটি চালু হলে বছরে ১৫০ কোটি টাকা আয় হবে। আমাদের গ্যাসকে আধুনিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করলে যে কোন তৈল সমৃদ্ধ দেশ হতে বেশী আয় হবে। এটা নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে "পেট্রো ডলারের" স্থান গ্যাস ডলার অধিকার করবে।

এতক্ষণ আমরা গ্যাস সম্পদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এবার আমরা গ্যাস সৃষ্টির মৌলিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করব। ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, পানি ছাড়া যেমন বাষ্প হয়না, তেমনি তৈল ছাড়া গ্যাস হতে পারে না। যে দেশের সর্বত্রই উৎকৃষ্ট মানের গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, সে দেশে তৈলের অস্তিত্ব থাকা অতি স্বাভাবিক। আমরা আগেই বলেছি আমাদের দেশে তৈলানুসন্ধানের গতি অতিশয় শ্লথ। বৎসরে গড়ে একটি কূপ খনন করে গড়ে প্রতি তিনটি কূপের একটিতে গ্যাস পাচ্ছে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৭ সালেই ৯৯৬২টি সন্ধানী কূপ খনন করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় দেশেই দশটি কূপ খনন করলে একটিতে তৈল বা গ্যাস পাওয়া যায়। আর বাংলাদেশে তিনটি কূপ খনন করে তার একটিতেই গ্যাস পাওয়া গেছে। (Dr K. M. Hossain : welcome address : the seminar on oil 1982) যে কারণে বাংলাদেশে গ্যাসের অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল, সেই একই কারণে তৈল অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। গ্যাস প্রাপ্তির পূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিজ থেকেই ভূপৃষ্ঠে গ্যাস বের হয়ে এসেছিল। এর ফলে অনুসন্ধান শুরু হয় ও গ্যাস পাওয়া যায়। একইভাবে বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে তৈল বের হয়ে আসছে। সন্ধান করে যেমন গ্যাস পাওয়া গেছে, তেমনি তৈল ও পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ ভূতত্ত্ব বিভাগ অন্তত তিনটি স্থানের ভূ-উপরিভাগে তৈল উপচে পড়ার কথা স্বীকার করেছে। এ স্থান তিনটির নাম পার্বত্য চট্টগ্রামের উতাল চাতরা এবং সিলেট জেলার পাথারিয়া ও হারার গঞ্জ (DK guha : paper presented in the Seminar on Petroleum exploration in Bangladesh—1982)

প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের আরো বহু স্থানের ভূপৃষ্ঠে তৈল উপচে পড়ছে। আমরা কয়েকটি স্থানের কথা উল্লেখ করতে পারি।

www.pathagar.com

জামালপুর হতে ৩৫ মাইল দূরে কাকরকান্দী ইউনিয়নের বড়ুয়া জানি গ্রামে বুড়িভোগাই নদীর তীরে তৈল উপচে পড়ছে। জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের আঞ্চলিক অধিনায়ক জনাব নজরুল ইসলাম কয়েক জন ম্যাজিস্ট্রেট ও সাংবাদিক সহ স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। (দৈনিক সংগ্রাম-১৭-৩-৭৭ইং)

নারায়ন গঞ্জের আলীরটেক গ্রামের লাল মিয়া মাতব্বরের মজা পুকুর খননকালে কেরোসিন বের হয়ে আসে। (বাংলার মুখঃ ৩-৪-৮০ইং)

যশোরের মোহাম্মদপুর থানার ডুমুরশিয়া গ্রামের এরফান উদ্দিন মোল্লাহর কূপ হতে কেরোসিন বের হয়েছে। (ইত্তেফাক ঃ ২/৬/৮১ইং)।

খুলনা শহরের মাত্র দুমাইল দূরে নজরুল নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে নলকূপ বসানোর সময়ে পাইপ দিয়ে কেরোসিন তৈল বের হয়ে এসেছে। মহকুমা প্রশাসক স্থানটি পরিদর্শন করেছেন (ইত্তেফাক ২০/৯/৮০ ইং)।

জানা গেছে, অতি সম্প্রতি যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার ঝিকরগাছা, নাভারনও বাগাচড়ার এক বিরাট এলাকা ব্যাপী পেট্রোলের সন্ধান পাওয়া গেছে। পেট্রো বাংলার ভূকম্পন জরিপ দল প্রায় ২/৩ বৎসর যাবৎ অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে সেখানে অনুসন্ধান কাজ শেষ করে বাংলাদেশ সরকারের নিকট বিরাট এলাকায় প্রেট্রোল প্রাপ্তির রিপোর্ট পেশ করেছে। এ অনুসন্ধান কাজের শেষ পর্যায়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞরাও পরীক্ষা-নিরিক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। পেট্রোবাংলার মতে উক্ত ঝিকরগাছা এলাকায় ড্রিলিং করলেই পেট্রোল পাওয়া যাবে। তবে ড্রিলিং করা ও আনুসঙ্গিক কাজ করার জন্য ২০/২৫ কোটি টাকার প্রয়োজন।

বাংলাদেশে গ্যাস আবিস্কারের পূর্বে এভাবে জাতীয় দৈনিকগুলি গ্যাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করেছিল। অবশেষে কল্পনার গ্যাস বাস্তবে আবিস্কৃত হয়েছে। তৈল সম্পর্কে এ কথা বলা যায়।

ভূতত্ত্ববিদগণ বাংলাদেশে তৈল প্রাপ্তি সম্পর্কে আশাবাদী। তাদের বক্তব্য হোল আসাম ও বাংলাদেশের ভূমির গঠন প্রকৃতি অভিন্ন।

www.pathagar.com

উভয় দেশ সুদূর অতীতে টেথীস সাগর তলে ছিল। কোন এক প্রাকৃতিককারণে হিমালয়সহ আসাম ও বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। আসামে এপর্যন্ত ৬টি তৈল খনি আবিষ্কৃত হয়েছে একই ভূপ্রকৃতি সম্পন্ন বাংলাদেশে তৈলের উপস্থিতি একান্তই স্বাভাবিক। ১৯৮২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বিদেশী ও দেশী তৈল বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে তৈল প্রাপ্তির ব্যাপারে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নোয়াখালী কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলের সাড়ে পনের হাজার ফুট গভীরে বরাইল শীলা (oligacene) প্রাপ্তির মাধ্যমে তৈল ডিপোজিটের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে (Dr A I. Kono nov, M, fariduddin Dr. M. A. Boul Mr. M. A. Matin and Dr B. I. Denega : possibility of oil Discovery in Bangladesh-myth or reality)।

কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিয়ানী বাজারে ইতিমধ্যে বরাইল শীলা পাওয়া গেছে। আসামে এ শিলা স্তরেই তৈল আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের তৈল ও গ্যাসের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ অভি-মত প্রকাশ করেছেন যে, এগুলি সঞ্চরণশীল। অন্য কোন স্থান হতে হিজরত করে প্রাপ্তিস্থলে অবস্থান নিয়েছে। আমাদের দেশে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, আসামের উচ্চভূমি হতে বাংলাদেশের নিম্ন ভূমির দিকে তৈল ও গ্যাস হিজরত করছে। বিশেষজ্ঞগণ নানা প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ অভিমত খণ্ডন করেছেন। তাদের মত হলো ২৮ হতে ৪০ মিলিয়ন বছর পূর্বে (বরাইল শিলার জন্মের যুগে) যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছিল তার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত এতদাঞ্চলের গাছপালাগুলি বগুড়া ও ফরিদপুরে কয়লার রূপ গ্রহণ করেছে। ঐ একইযুগের মৃত জীবজন্তুর ফসিল হতে নিষিক্ত তৈল সম্পদ কোথায় গেছে? এ সম্পর্কে তাদের মত হলো, তরল পদার্থ তৈল আরো নীচের দিকে নেমে গিয়ে কোন কঠিন শিলার আবেষ্টনীতে বাধা পেয়ে সঞ্চিত হয়েছে। বহু যুগব্যাপী সঞ্চিত হতে হতে সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়েছে। এ চাপের ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিলা ভেদ করে প্রথমে গ্যাস ও পরে তৈল ধীরে ধীরে উচ্চভূমির দিকে উঠে আসছে।

www.pathagar.com

গতিপথে কঠিনতর শিলার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে কোথাও কোথাও নরম শিলার ফাঁক ফোকর দিয়ে গ্যাস ও তৈল ভূ পৃষ্ঠের উপরিভাগে আত্মপ্রকাশ করছে। এ মতবাদের অনুসারীগণ মনে করেন যে, বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলে ও উপকূলে তৈল প্রাপ্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরোক্ত অভিমতের পেক্ষাপটে বাংলাদেশের তৈলের উৎস ও প্রাপ্তি সম্পর্কে নতুনভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে হবে। ডঃ লিজ ও জনাব কবির বাংলাদেশে তৈলানুসন্ধানের প্রচলিত রীতি কার্যকর নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশে সম্প্রতি পরিচালিত সিস্ মোগ্রাফিক পরীক্ষার ফলাফলে ইতিপূর্বেকার ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। যাহোক এদুজন বিশেষজ্ঞ অন্যদের মত বাংলাদেশে তেলপ্রাপ্তির ব্যাপারে গভীরভাবে আশাবাদী (পূর্বোক্ত সেমিনারে গঠিত প্রবন্ধ দ্রঃ)।

বাংলাদেশে তৈল উত্তোলনের বিষয়টি একটি চক্রান্তের দ্বারা ক্রমাগত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব।

বাংলাদেশে অতি উৎকৃষ্টমানের কয়লার বিশাল মজুদ আছে। বগুড়া রাজশাহীর জামালগঞ্জে অতি উৎকৃষ্টমানের অন্তত ১০৯৩'৯ মিলিয়ন টন কয়লা মজুদ আছে। তাছাড়া ফরিদপুর জেলায় ১২৫ মিলিয়নটন ও খুলনায় ৪ মিলিয়ন টন কয়লার মজুদ আছে (Journal Bangladesh Geological society, 3rd February 1982)।

এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে চাক্ষুসভাবে কয়লার মজুদ প্রমানিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি স্থানের কথা উল্লেখ করব, যেখানে কয়লা পাওয়া গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের লামা থানায় ভূ পৃষ্ঠে তিন মাইল জুড়ে পাথুরে কয়লা পাওয়া গেছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ উক্ত কয়লা দিয়ে রান্না-বান্নার কাজ করছে। (সংগ্রাম ঃ ১৯/৫/৮০ ইং, গণকন্ঠ ১/৬/৮১)।

সাতক্ষীরার তালা থানার সরুলিয়া শকদহ গ্রামে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রামবাসী উক্ত কয়লা রান্নার কাজে ব্যবহার করছে। (ইত্তেফাক ১৭/৭/৭৭)।

রংপুর জেলার গাইবান্ধায় কয়লা পাওয়া গেছে (ইত্তেফাক ১৫/৫/৮০)। নীলফামারী থানার পঞ্চ-পুকুর ইউনিয়নের কিসমত পঞ্চ-পুকুর গ্রামের

www.pathagar.com

কালুয়া মামুদের পুকুরের মাত্র ৮ ফুট মাটির নীচে কয়লা পাওয়া গেছে। ইটের ভাটার মালিকগণ ইট জ্বালানোর জন্য উক্ত কয়লা ব্যবহার করছে (ইত্তেফাক ৩-২-৮২)।

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ থানার জাঐল ইউনিয়নের লাহিড়ী বাড়ী গ্রামে পাথুরে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে (ইত্তেফাক ২৪-৪-৮০)।

জানিনা জনসাধারণ কর্তৃক আবিস্কৃত এসব কয়লা খনি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা?

বাংলাদেশে সিমেন্ট তৈরীর প্রধান উপকরণে চুনাপাথরের বিশাল মজুদ আছে। জামালগন্জ সেন্টমার্টিন দ্বীপ, টাকের ঘাট, লালঘাট ও বাংগালী বাজারে কমপক্ষে ১৪৫'৮ মিলিয়ন টন চুনা পাথর মজুদ আছে (Journal, Bangladesh Geological society 3rd nov 1978)।

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে white clay বা সাদা মাটির মজুদ আছে। চীনা মাটির তৈজসপত্র, যাকে ইংরাজীতে ক্রোকারী বলা হয় তার প্রধান উপকরণ এই সাদামাটি। মোমেনশাহী জিলার বিজয়পুর ও চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ায় অন্তত ৭৭৬৪০০০ মিলিয়ন টন সাদামাটি মজুদ আছে (Bangjadesh geological Society : Report published in the jouraai 3rd/February 1982)।

বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে কঠিন শিলার মজুদ আছে। রাস্তা পুল, রেলপথ, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি নির্মাণের কাজে কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয়। এসব কাজে কঠিন শিলাব্যবহার করলে এক দিকে ইট পোড়ানো বাবদ কোটি কোটি টাকার জ্বালানি বেঁচে যাবে। অপরদিকে শিলার দ্বারা প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানের আয়ও বহুগুণ বেড়ে যাবে।

আমাদের দেশের নিম্ন উল্লেখিত স্থানে কঠিক শিগার মজুদের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

স্থান	পরিমাণ

১। মধ্যপাড়া, দিনাজপুর। এত বিপুল যে কঠিন শিলা আজো সঠিক নিরূপণ পরিমাণ করা সম্ভব হয়নি।

২। ভোলাগঞ্জ (নুড়িপাথর) সিলেট, ১১৭ মিলিয়ন কিউবিক ফিট

৩। লুবা (নুড়ি পাথর) সিলেট ১০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট

www.pathagar.com

৪। পিয়াইন গং (নুড়িপাথর) সিলেট ৩০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট
৫। পাটগ্রাম (নুড়িপাথর) রংপুর ৩৫ মিলিয়ন কিউবিক ফিট
৬। পঞ্চগড় (নুড়িপাথর) দিনাজপুর ২৪ মিলিয়ন কিউবিক ফিট।

(পূর্বোক্ত রিপোর্ট)

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচ বালু (Glass sand) আছে। কাঁচ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হলো কাঁচ বালু। জামালপুরের বালিয়াজুরী মৌজায়, সিলেটের শাহজীবাজার, কোলাপুরা ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে অন্তত ৩.৫৫ মিলিয়ন টন কাঁচ বালুর মজুদ রয়েছে।

বাংলাদেশে লোহা, তামা ও অভ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। রংপুর জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার তিস্তা নদীর তীরে হরিপুর নামক চরে মাইকা ও অক্সাইড আকারে প্রচুর লোহা পাওয়া গেছে। ঐ এলাকায় একই সাথে তামা এবং অভ্রের সন্ধানও পাওয়া গেছে। গাইবান্ধা কৃষি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্থানীয় জনসাধারণের নিকট খবর পেয়ে তিস্তার চরে গমন করেন এবং লোহা, তামা ও অভ্রের নমুনা সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশ সরকারের ভূজরিপ বিভাগ উক্ত এলাকার অনুসন্ধান চালিয়ে উপরোক্ত তিন প্রকারের ধাতু প্রাপ্তির সত্যতা স্বীকার করেছে। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনও উক্ত এলাকায় অনুকরে লোহা ও অভ্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা স্বীকার করেছে। রংপুর জেলার সুন্দরগঞ্জ ও ডিমলা থানার প্রায় একশত বর্গ মাইল ব্যাপী লোহা, তামা ও অভ্র খনির অবস্থানের সম্ভাবনা আছে বলে ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন (দৈনিক দেশ ৮-১-৮২-ইং)

বাংলাদেশের জনৈক কবি গানে লিখেছেন:

সোনা সোনা সোনা। লোকে বলে সোনা, সোনা নয় তত খাঁটি!
বল যত খাঁটি, তার চেয়ে খাঁটি বাংলাদেশের মাটি!!

সত্যই বাংলাদেশের মাটি কবির কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। বাংলাদেশের কোন কোন মাটি সোনার চেয়েও মূল্যবান। বাংলাদেশের উপকূলে এমন সব বালুকার সন্ধান পাওয়া গেছে বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় যার অপরিসীম মূল্য রয়েছে।

কক্সবাজার উপকূলের বালিতে মহা মূল্যবান জিরকন (Zircon) রুটাইল (Rutile), এলমিনাইট (Ilmenite), ম্যাগনেটাইট (Magnetite

www.pathagar.com

কেয়ানাইট (Kyanite). ও মোনাজাইট (Monazite) সহ মূল্যবান খনিজ পদার্থ রয়েছে। এসব মূল্যবান খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান ও ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য বা লা:দেশ আণবিক শক্তি কমিশন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে একটি পাইলট প্রজেক্ট (pilot projcct) স্থাপন করেছে। আণবিক শক্তি কমিশনের অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিকগণ নমুনা স্বরূপ সতেরোটি স্থানের সামুদ্রিক বালি পরীক্ষা করেছেন। উক্ত ১৭টি স্থানের ৬টি মূল ভূখণ্ডের উপকূলে ও বাকী ৯টি দ্বীপাঞ্চলে। সমুদ্র পৃষ্ঠ ১ হতে ২ মাইলের মধ্যে এসব খনিজ পদার্থ অবস্থান করছে। পরীক্ষাগারের খনিগুলি ৫০০-১০,০০০ ফুট লম্বা, ৫০-১০০০ ফুট চওড়া ও ৩-১৫ ফুট গভীর। আণবিক শক্তি কমিশনের মতে এসব স্থানের বালিতে শতকরা ২০ ভাগ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। আণবিক শক্তি কমিশনের ভাষ্যমতে এ যাবৎ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন জিরকন ৯ লক্ষ টন এলমিনাইট, ৭ হাজার টন রুট'ইল, ৭ হাজার টন ম্যাগনেটাইট ও ৭ হাজার টন লিউ কোক্সেন (Leu coxene) পাওয়া গেছে (Bangladesh Atomic Energy Commission; Atomic energy—programme in Bangladesh, Exploration of Beach sand minerals—June, 1982)।

আণবিক শক্তি কমিশনের ভাষ্যমতে বাংলাদেশের উপকূলের কোন কোন এলাকার বালুকায় প্রায় তিন ভাগের একভাগ খনিজ পদার্থ। আণবিক শক্তি কমিশন উপকূলের ১৭টি স্থানে নমুনা স্বরূপ গৃহীত ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৩৬ টন বালুকার ৯৬৩৪৮ টন খনিজ পদার্থ পেয়েছে (Bangladesh Atomic Commssion Annual Techical Report July 1981—June 1982 P—6 & 7)।

উপকূলীয় বালু সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলের মতে বাংলাদেশের উপকূলের বালুতে খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৮০ হতে ৯০ ভাগ। বাংলাদেশ প্রকৃতি বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এম, আই চৌধুরীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একদল বিজ্ঞানী নিঝুম দ্বীপের ৩৫ বর্গমাইল এলাকা জরীপ করে উপরোক্ত মত প্রকাশ করেছেন (এম আই চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন ১২-২-৭৭)।

বাংলাদেশের উপকূলে প্রাপ্ত এসব খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি

www.pathagar.com

কমিশনের ভাষায় "The economic aspect of these beach sand minerals lies in theire variety of uses in industy. For example Rutile, limenite and Leucoxene are sources of Titanium used in space vehicles. (Bangladesh Atomic Energy Commission : Atomic Energy Programme in Bangladesh June, 1982। সরল ভাষায় এসব উপকূলীয় বালু অর্থ নৈতিক ব্যবহার শিল্পে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রুটাইল, এলমিনাইট ও লিউ কোক্সেন মহাশূন্য যানে ব্যবহৃত টিটানিয়ামের উৎস।

জিরকন আণবিক রি একটর তৈরীর কাজে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। পারবাণবিক রেডিয়েশন রোধ করণার্থে জিরকন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া উপকূলের খনিজ পদার্থ রাসায়নিক শিল্পে ইলেকট্রোনিক দ্রব্যে (প্যারাইড-রড), রঙ্গিন টেলিভিশনে, ধাতু দ্রবণে, কাঁচ তৈরীতে, চীনামাটির (Crockeay) দ্রব্যে, ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের মতে সামান্য উদ্যোগ নিলেই বাংলাদেশের সিরামিক ও গ্লাস শিল্পের জন্য বিদেশ হতে কোন কাঁচামাল আমদানি করতে হবে না। বরং বাংলাদেশের কাঁচামালেই অতি উৎকৃষ্ট মানের সিরামিক ও কাঁচের দ্রব্য বিদেশী বাজারে রপ্তানী করা যাবে।

বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ইতিমধ্যে উপকূলের এসব খনিজ দ্রব্য বাজারজাত করে অর্থোপার্জন শুরু করেছে। ১৯৮০-৮১ সালে আণবিক শক্তি কমিশন অতি স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন ধরনের খনিজ বালি বিক্রি করেছে। চট্টগ্রামের মেসার্স বিসমিল্লাহ টেডার্স ১২ হাজার টাকায় ২ টন ম্যাগনেটাইট ও ৪ হাজার টাকায় অর্ধটন ইলমিনাইট, ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণ প্রতি কেজি ১০০ টাকা দরে ১০ কেজি ও সাভার আণবিক রি-এ্যাক্টর প্রচুর পরিমাণে ইলমিনাইট ও ম্যাগনেটাইট ক্রয় করেছে। (Sale proceeds of pilot plant products : Bangladesh Atomic Energy Cmmission, 1981-82)

আণবিক শক্তি কমিশনের একজন কর্মকর্তা আমাকে বলেছেন শুধমাত্র সাভার আণবিক রি-একটর বৎসরে ১৮ লক্ষ টাকার জিরকন ক্রয় করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে ঐ পরিমাণ জিরকন ক্রয়ের জন্য আণবিক রি-একটরকে বৎসরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে

www.pathagar.com

হতো। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন আন্তর্জাতিক বাজারের দশ ভাগের এক ভাগ মূল্যে উপকূলীয় খনিজ দ্রব্য বিক্রি করেছে।

আমরা আগেই বলেছি, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ১৫টি স্থানের কয়েক হাজার বর্গফুট জায়গা হতে বিভিন্ন প্রকারের ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন দ্রব্য সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অতি মূল্যবান ৯ লক্ষ টন ইলমিনাইট ও ৭ হাজার টন রুটাইল। আন্তর্জাতিক বাজারে এক টন ইলমিনাইটের মূল্য কমপক্ষে ১৬ হাজার টাকা ও এক কেজি রুটাইলের মূল্য এক হাজার টাকা। কয়েক হাজার বর্গফুটে সাড়ে বারো লক্ষ টন খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলে, টেকনাফ হতে দক্ষিণ তালপট্টি পর্যন্ত ১৮ শত বর্গ মাইলের উপকূলে কত হাজার কোটি টাকার খনিজ দ্রব্য আছে তা অনুভব করাও কষ্টকর। তাই কবির কল্পনার নয়, বাস্তবিকই বাংলাদেশের মাটির মূল্য সোনার চেয়ে মূল্যবান।

আজকার আণবিক যুগে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা সবাই ভারতের তারাপুর আণবিক রি-এ্যাকটরের জ্বালানী সংকট ও তা হতে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে জানি। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্টমানের ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম আছে। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ইউএন ডিপি'র আর্থিক সহযোগিতায় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের সন্ধান লাভ করেছে। ইউএন ডিপি ইউরেনিয়াম সন্ধানের জন্য ২৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ডলার দান করেছে। ১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সী বাংলাদেশকে বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতি দিয়ে ইউরেনিয়াম সন্ধানের জন্য সাহায্য করে। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়। মাত্র ৫ মাসের মধ্যে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায় (দৈনিক বাংলা ১৯-৪-৭৭)।

আণবিক শক্তি কমিশনের ভাষায়ঃ Over the years, from reconnaissance and ground radiomatric survey data collected with exposed rock fromations many redioactive anamolies were est ablished in some selected regions of Chittagoag, Chittagong Hilltracts and Sylhet.

...The Exploration survey conducted so far confirmed

www.pathagar.com

the potential of an oconomically viable deposit of uranium and theorium in Bangladesh."

(Bangladesh Atomic Energy Commisson: Atomic Energy—programme in Bangladesh. June 1982).

সহজ ভাষায় বলা যায় আকাশ হতে অনুসন্ধানমূলক (Rcconnaisance) ও ভূমিতে রেডিওমেট্রিক (Radiometric) সার্ভে দ্বারা সংগৃহীত নমুনাসমূহে তেজস্ক্রিয়া পাওয়া গেছে।

আজ পর্যন্ত পরিচালিত অনুসন্ধানমূলক সার্ভের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক যথেষ্ট পরিমাণে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মজুদ আছে। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় কতিপয় অঞ্চলে এই মূল্যবান পদার্থের অবস্থান নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আণবিক শক্তি কমিশনের মতে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের ডিপোজিট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আণবিক শক্তি কমিশন বলে ঃ

In view of the vast prospective areas to be covered in Sylhet, Chittagong Hilltracts and northern districts. it was felt that geochemical exploration technlques should also be applied along with grouud radiometric Survey." (পূর্বোক্ত সূত্র)। উপরোক্ত বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও উত্তরাঞ্চলে জিলাগুলোর বিশাল এলাকায় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

আমরা এতক্ষণ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো ঃ বাংলাদেশে গ্যাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। উৎকৃষ্টমানের পেট্রোল আছে। প্রাপ্ত গ্যাস হতে উপজাত হিসেবে যে পেট্রোল পাওয়া যাবে বর্তমান বাজার দরে তার মূল্য কমপক্ষে ৩০ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশে প্রচুর উন্নতমানের কয়লা আছে। এর অর্থ হলো আজকে বিশ্বে সাধারণভাবে ব্যবহৃত সব কয়টি জ্বালানী বাংলাদেশে আছে। তাছাড়া রকেটে ব্যবহার যোগ্য ও আণবিক চুল্লির তৈরীর প্রয়োজনীয় ধাতু জিরকন, ইলমিনাইট, লিউকোক্সেন, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মত জ্বালানী বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

www.pathagar.com

দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার যে বিশাল মজুদ তা আমাদের একটি মূল্যবান সম্পদ। আমাদের অসংখ্য নদ-নদীকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সর্বাধিক ফল লাভের লক্ষ্যে এ শিলাকে ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে নুড়ি পাথরের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে তা রাস্তা ঘাট, রেলওয়ে, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যায়। সিমেন্ট তৈরীর প্রধান উপকরণ চুনা পাথরের বিশাল মজুদ রয়েছে আমাদের দেশে। সিমেন্ট আমদানীতো নয়ই বরং প্রচুর রপ্তানী করতে পারি। কাঁচ ও সিরামিক দ্রব্য প্রস্তুতের সকল প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে আছে।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, খনিজ সম্পদে বাংলাদেশের মত সমৃদ্ধ দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেরই আমাদের বর্ণিত সম্পদের একটি কি দুইটি আছে এবং তার বদৌলতেই দেশগুলি ধনী দেশরূপে পরিচিত হয়েছে।

আমরা এতক্ষণ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার কৃষি সম্পদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

www.pathagar.com

কৃষিজ সম্পদ

বর্তমানে প্রবন্ধে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে প্রাপ্ত সকল সম্পদকে কৃষিজ সম্পদরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। এর দু'টি ভাগ রয়েছে। কৃষকদের উৎপাদিত সম্পদ ও নিজ থেকে উৎপাদিত সম্পদ বা বনজ সম্পদ।

কৃষিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে বাংলাদেশের ভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সর্ব পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। আকারে বাংলাদেশ খুব ছোট নয়। এর আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গ মাইল। এদেশ ২১'২৫´ ও ২৬'৩৮´ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮,'০১ ও ৯২'৪০´ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশ পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব দিকের অধিকাংশ অংশ ভারত দ্বারা বেষ্টিত।

বাংলাদেশ ও আসামের মধ্যে ১১১৩ মাইল বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে ১১৯৬ মাইল এবং বাংলাদেশ ও বার্মার মধ্যে ১৭৪ মাইল সীমান্ত রয়েছে।

বাংলাদেশে ৩২০০ বর্গ মাইল নদী রয়েছে। তাছাড়া ১৭ লক্ষ ৬৯ হাজারটি ছোট বড় পুকুর ও দীঘি যার পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৩৫ একর এবং ৪০ হাজার ১৫ একর এলাকায় বিল ও জলাভূমি রয়েছে। বাংলাদেশের ৪৪৫ মাইলের উপকূল আছে।

১৯৬০-৬১ সালে মাথা প্রতি জমির পরিমাণ ছিল '৪০ শতাংশ আর ১৯৭৯-সালে তা কমে গিয়ে মাত্র '২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭৮ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ২৯টি চাষী পরিবারের চাষের কোন জমি নাই। শতকরা ৩৩টি পরিবারের চাষের জমির পরিমাণ হলো এক একরের নীচে এবং শতকরা তিনটি পরিবারের জমির পরিমাণ পাঁচ একর বা তার চেয়ে

www.pathagar.com

বেশী। চাষযোগ্য মোট জমির প্রায় ২৫ ভাগ এদের মালিকানাধীন (Agriculture in Bangladesh : Edited by by Dr. Iqbal Mahmud and A Z M. Obaidullah Khan and others, Published by B. A D. C, 1931, P-10)

বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ মোট ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর এবং চাষকৃত জমির পরিমাণ ২ কোটি ২০ লক্ষ একর। এর মধ্যে ৮০ লক্ষ একর জমিতে বছরে দুইবার ও ১ কোটি ২৫ লক্ষ একরে বছরে তিনবার ফসল উৎপন্ন হয় (আমিন ও গফ্ফার : কৃষি তত্ত্ব পৃঃ ১৫)।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থায় মতে বাংলাদেশে ১ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে ইরি-বোরো রোপা আমন ধান, ৭০ লক্ষ একর জমিতে ইরি আমন, ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ একর জমিতে গম, ৯০ লক্ষ একর জমিতে শীতকালীন তেল বীজ, ৩০-৫০ লক্ষ একর জমিতে আখ ও ২০ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয় (Agriculture in Bangladesh. p—19-24)

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম অববাহিকা সমভূমি। গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনার মত বৃহৎ নদীর মাধ্যমে বাহিত পলি দ্বারা বাংলাদেশের ভূমি গঠিত হয়েছে। পূর্বের আরাকান পাহাড়, উত্তরের হিমালয় পর্বত ও পশ্চিমের বরেন্দ্র ভূমি হতে নেমে এসেছে বঙ্গীয় সমতল ভূমি। এক পাশের গলুইহীন নৌকার মত বাংলাদেশের ভূমির গঠন প্রকৃতি।

বিশ্ব সংস্থা জরিপ করে বাংলাদেশের ভূমিকে মোট ২০ ভাগে বিভক্ত করেছে (বাংলাদেশে সয়েল রিসোর্সেস ঃ সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট ম্যাপ ৪, টেকনিক্যাল রিপোর্ট ও ইউএনডিপি, ফাও রোম—১৯৭১)। এই ২০ ভাগে বিভক্ত ভূমিকে তিনটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথাঃ পাহাড়, উচ্চ সমতল ভূমি ও বন্যার প্লাবিত নিম্ন সমতল ভূমি। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা সিলেট ও মোমেনশাহী জিলায় অবস্থিত ছোট-বড় পাহাড়, দ্বারা উচ্চ পার্বত্যাঞ্চল গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃংখলের নাম কিউপ্রদনী (পার্বত্য চট্টগ্রাম)। ইহার উচ্চতা ৪০৩৪ ফুট। বাংলাদেশের মোট ১২% ভাগ এই পার্বত্যাঞ্চল দ্বারা গঠিত। ঢাকা জেলার

www.pathagar.com

জয়দেবপুর হতে শুরু হয়ে টাঙ্গাইল জেলা ও মোমেনশাহী জেলার মধুপুর গড় নামক পরিচিত কিছু অঞ্চল এবং রাজশাহী বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে অবস্থিত বারীন্দ্র ভূমি নামে পরিচিত অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশের উচচ বনভূমি অঞ্চল গঠিত। দেশের মোট ৮ ভাগ এই অঞ্চল ভুক্ত। দেশের বাকী ৮০ ভাগ নিম্ন সমভূমি নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের প্রায় সব জমিই উর্বর। এদেশে প্রতি বর্গমাইলে ২০২০ জন লোক বাস করে। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এরূপ ঘন বসতি আছে। এ যাবৎ কাল এদেশের ভূমিই এ বিশাল জনতাকে আহার যুগিয়ে আসছে ভূমির উর্বরতার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের ভূমির প্রকৃতি সম্পর্কে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা বলে," Yet throughout much of the country fertile soil, criss-crossed by rivers and canals ovelie massive reserves of excellant ground water. High radiant energy, a temparature range suitable for year round crop production and an abundance of labour could be combined to produce croup yeild equal to or higher than those of most Asian countries.' (Agriculture in Banglcdesh)

উপরোক্ত বক্তব্য হতে স্পষ্ট যে, অসংখ্য নদী-নালা দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভূমধ্যস্থ পানি দ্বারা সমৃদ্ধ অনুকূল আবহাওয়া সম্পন্ন বাংলাদেশেম ভূমির সাথে শ্রমের সমন্বয় ঘটালে এশিয়ার অধিকাংশ দেশ হতে বেশী শস্য উৎপাদন করা যাবে আর সারা বৎসরব্যাপী বাংলাদেশে শস্য ফলানো যায়।

বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দেশের সর্ব পশ্চিমাংশে বৎসরে গড়ে ৫০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বার্ষিক গড়ে ২০০" ইঞ্চি। এদেশে বিষুব রেখার কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এর আবহাওয়া মোটামুটি মধ্যম। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক বাংলাদেশের বৃষ্টির পরিমাণ উত্তাপের তারতম্য ও মাটির উপাদানসমূহ বিশ্লষণ করে অভিমত প্রকাশ

www.pathagar.com

করেছেন যে, বাংলাদেশের মাটি অতি উৎকৃষ্ট ও উর্বরা (আমিন ও গাফফার ; কৃষিতত্ত্ব, বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও প্রধান ফসল পৃঃ ৪৭—৫৯)।

উপরোক্ত দুইজন বিশেষজ্ঞ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) কর্তৃক শ্রেণী বিন্যাসকৃত বাংলাদেশের ২০ রকমের জমির ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের জমি পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত।

বিশ্ব কৃষি সংস্থার (FAO) প্রাক্তন উপদেষ্টা ডঃ আবদুল আলীম বাংলাদেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, বৃষ্টির পরিমাণ, দিনের দৈর্ঘ্য, তাপের তারতম্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের জমি অতি উর্বর ও এর আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের অতি সহায়ক (ডঃএ, আলীম ঃ বাংলাদেশের কৃষি তত্ত্ব পৃঃ ৬—১৩ দ্রঃ)।

বাংলাদেশের জমির উর্বরতা অনুধাবনের জন্য কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন হয় না, সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই বাংলাদেশের ভূমির উর্বরতা বুঝতে পারে। বাংলাদেশের যেখানেই যাই, যখনই যখন যাই—ফলে-ফুলে, শস্য-শ্যামলে নয়ন জুড়িয়ে যায়। জাপান ভ্রমণকালে দেখেছি সেখানকার জমি কত অনুর্বর। ধান গাছগুলি হলদে মরো মরো ভাব। আর তাকে রক্ষার জন্য, তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য এক অপরিসীম কসরৎ। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে জাপান যা উৎপাদন করে, জাপানের জাতীয় অর্থনীতির ভাণ্ডারে তার পরিমাণ মাত্র ১৭ ভাগ। আর আমাদের দেশের কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের কোন সুবিধার প্রয়োগ ছাড়াই আমাদের অর্থনীতির ৯৫ ভাগ আসে কৃষি হতে ! হাজার বছর যাবৎ বাংলাদেশের কৃষিতে কোন পরিবর্তন হয়নি। সামান্য উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশের মাটি যে কিভাবে ফসল ফলাতে পারে কুমিল্লা একাডেমীতে গেলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁটাবন এলাকায় শুধু মাত্র ড্রেনের পানি সিঞ্চন করে কেমন ফসল ফলানো হচ্ছে তা সত্যি চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশের মাটিতে পরিমাণ মত

www.pathagar.com

পানি দিতে পারলেই সোনার ফল পাওয়া যায়। আর সেই পানি নিয়েই চলছে রাজনৈতিক ঘাপলা।

আমরা এতক্ষণ বাংলাদেশের অবস্থান, ভূমি গঠন ও জমির উর্বরতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এবার এদেশে উৎপাদিত ফসল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতে বৎসরে তিন বার ফসল উৎপাদন করা যায়। সমতল ভূমির অধিকাংশ এলাকায় খরিপ ও রবিশস্য উৎপাদনের জন্য কোন সেচের প্রয়োজন হয় না। উপকূলের চরাঞ্চলেও আমন ধান ও রবি শস্য উৎপাদনের জন্য সেচের প্রয়োজন হয় না। এতদিন যাবৎ আল্লাহ্‌র প্রকৃতির দানেই এ সামান্য জমিতে বাংলাদেশের বিশাল জনতার খোর পোষের ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে আবাদযোগ্য জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ করলেই আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ অনায়াসে দ্বিগুণ করা যায়।

বাংলাদেশে নিম্নোল্লেখিত ফসল উৎপাদিত হয়ঃ—(১) খাদ্য শস্যঃ—ধান, গম, যব, কাউন ইত্যাদি।

(২) আঁশজাত শস্যঃ—পাট, মেস্তা, শনপাট, রিহা, কার্পাস তুলা ইত্যাদি।

৩। ডালশস্যঃ খেশারী, মশুর, ছোলা, কলাই, মুগ মটর বরবটি, অড়হর, সিম, ইত্যাদি

৪। তৈল বীজ শস্যঃ—সরিষা, তিল, সূর্য্যমুখী, কুসুমফুল, চীনাবাদাম, রেড়িং, তিসি, নারিকেল, পাম ইত্যাদি।

৫। নেশাজাতীয় ফসলঃ— তামাক, পান, সুপারী, গাঁজা, ধুতরা ইত্যাদি।

৬। সবজিঃ—আলু, সিম, মূলা, কপি, নানা প্রকারের শাক, মিষ্টি আলু, বেগুন, শালগম, লাউ, কুমড়া, ধুন্দুল, করোলা, কুসি বা রেখা, শাপলা, টমেটো ইত্যাদি।

৭। মসলাঃ—মরিচ, হলুদ, আদা, মৌরী তেজপাতা, পেয়াজ, রসুন, গোল মরিচ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৮। ফল ঃ—আম, জাম, কাঠাল আনারস, কাজুবাদাম তাল, লিচু পেয়ারা সবেদা, খেজুর, তেতুল, লেবু, আতা, কুল, বেল, কতবেল, কামরাঙ্গা, বাতাবীলেবু, চালতা, আমলকি, জলপাই, কামরুল, গোলাপ জাম, তরমুজ, খিরা, কলা, শসা, কমলা ইত্যাতি।

(৮) মিষ্টি জাতীয় ফসল ঃ—আখ, খেজুর রস, তাল রস, বীট ইত্যাদি।

(৯) ঔষধি ফসল ঃ—থানকুনি, শিয়াল কাটা, কাল কুঁচা, ওলট কোমল, ঘৃত কুমারী, পাথর কুচি, কলমী শাক, বিষ কাটালী, হাড় ভাঙ্গা লতা ইত্যাদি।

(১০) অন্যান্য অর্থকরী ফসল ঃ—রাবার, চা ইত্যাদি।

এক কথায় বলা যায় পৃথিবীতে এমন ফসল কমই আছে যা বাংলাদেশের মাটিতে উৎপন্ন হয় না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সামান্য উদ্যোগ নিলেই বাংলাদেশে অন্ততঃ দ্বিগুণ পরিমাণ ধান ফলানো যাবে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার ভাষায় উন্নতমানের বীজ ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক সুবিধা প্রয়োগের মাধ্যমে ধান উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় চারগুণ করা যাবে, while local improved varities yeild 25 mds in excess per acre. The modern varities may yield 60—100 mds. (Agriculture in Bangladesh, P—51)। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির আশাবাদ যে অলীক নয় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা-প্রজেক্ট দেখলেই বুঝা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ধানের ফসল সম্পর্কে আলোচনা করব না। বরং এমন সব অতীব লাভজনক ফসল সম্পর্কে আলোচনা করব যা আমাদের মাটিতে উৎপাদিত হয় না বলে মনে করা হয়।

পূর্বে ধারণা ছিল বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া গম জন্মানোর উপযুক্ত নয়। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের দেশের সব অঞ্চলেই উৎকৃষ্টমানের গম উৎপাদিত হয়। ১৯৭৫ সালে দেশী জাতের বীজ ব্যবহার করে একর প্রতি ১০ মণ ১১ সের গম উৎপাদন করা হয়েছে। (Agriculture in Bangladesh—P-63)। অথচ ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ১৫ লক্ষ একর জমির ১৪ লক্ষ ৪৫ হাজার একরে উন্নত মানের বীজ ও বাকী ৫৫ হাজার একর জমিতে উন্নত মানের

www.pathagar.com

বীজ ব্যবহার করে একর প্রতি গড়ে প্রায় ২১ মণ হিসাবে মোট ১২ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয়েছে। সামান্য উদ্যোগ নিলেই অতি অল্প ব্যয় ও শ্রমে গম বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান ফসলে পরিগণিত হতে পারে। গম উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি বহুলাংশে হ্রাস করা যায়। গম চাষ করলে আমাদের দু'টি সুবিধা হবে। বাংলাদেশে এমন কিছু জমি আছে যাতে ধান বা পাট কোনটাই প্রচুর পরিমাণে ফলে না। এসব জমিতে গম চাষ করলে প্রচুর ফসল পাওয়া যাবে।

তাছাড়া গম চাষে খুব বেশী পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। ফলে শীতকালীন পানি সংকট গম চাষে ব্যাঘাত হয় না। আমাদের কৃষকগণ ক্রমাগতভাবে গম চাষে উৎসাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র নতুন নতুন উন্নতমানের গমের বীজ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রায় শেষ যুগ পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, বাংলাদেশের মাটি তুলা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত নয়। যাহোক পাকিস্তানের শেষ বৎসরগুলিতে এ নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। প্রকৃত অবস্থা হলো বাংলাদেশের মাটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তুলা উৎপাদনের উপযোগী। বাংলাদেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট মানের তুলা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ উৎপন্ন করতে পেরেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মুঘল শাসনের শেষ দিকে বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট মানের তুলা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন বিখ্যাত মসলিন কাপড়ের সুতার জন্য তুলা ঢাকা জেলার কয়েকটি স্থানে উৎপন্ন হতো। এ তুলার নাম ছিল কার্পাস। কাপাসিয়া, ধামরাই ও ডেমরা অঞ্চলে এই কার্পাস তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। কার্পাসের নামানুসারে কাপাসিয়া নামকরণ হয় (F. Bernier Travel into the Moghul Empire দ্রঃ)। তৎকালে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হতো। তৎকালে আমাদের দেশে কোন বস্ত্র আমদানি করতে হতো না। বরং এদেশের বস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশে রফতানি হতো। বস্ত্রের বুনন ও রং শিল্পে বাংগালীদের কারিগরি জ্ঞান তৎকালীন বিশ্বে ছিল শ্রেষ্টতম। ১৯০ বৎসরের বৃটিশ শাসনের

www.pathagar.com

ফলে আজ একথা বিশ্বাস করাও কষ্টকর।

যাহোক বাংলাদেশের ভূমি যে তুলা উৎপাদনের উপযুক্ত এতে কোন সন্দেহ নেই। "Even two centuri's back, the country, cloths requirement was met from own cotton" (Agriculture in Bangladesh, P.64)। আজ আমাদের প্রয়োজনের সি হভাগ তুলা বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। সুখের কথা ইদানীং আমাদের দেশে আবার তুলা উৎপাদন শুরু হয়েছে। ১৯৭৬-৭৮ সালে তিন হাজার একর জমিতে ১৪ শত বেল তুলা উৎপাদিত হয়েছে। গড়ে একর প্রতি প্রায় দু'মণ তুলা উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে ২৪ হাজার ৪ শত একর জমিতে চাষ করে ১৬ হাজার বেল তুলা পাওয়া গেছে। একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ পৌনে তিন মণেরও বেশী। ১৯৮২-৮৩ সালে বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক মণেরও বেশী তুলা উৎপাদিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচুর তুলা উৎপাদিত হয়। কিছু দিন পূর্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লক্ষ অধিবাসী বাজার হতে কোন বস্ত্র ক্রয় করতো না। তারা নিজেদের উৎপাদিত তুলা দ্বারাই প্রয়োজনীয় বস্ত্র বয়ন করত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চল, যেখানে ধান-পাট বা গম উৎপন্ন হয়না, সেখানে তুলা চাষ করে ও দেশের অন্যান্যস্থানে তুলার চাষ বৃদ্ধি করে আমরা বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি।

এই কিছু আগেও আমাদের ধারণা ছিল যে, বাংলাদেশের মাটি রাবার চাষের অনুপযোগী। কিন্তু আমাদের সে ধারণা বর্তমানে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধরনের রাবার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রামের কতিপয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্টমানের রাবার উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানের প্রায় ১২৫৯৮ একর জমিতে রাবার চাষ করা হচ্ছে। ১৯৮০-৮৪ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৯লক্ষ ৮৪ হাজার পাউণ্ড রাবার উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ সালে ২১০৬৮ একর সরকারীভাবে ও ৪০,০০০ একর জমি বেসরকারীভাবে রাবার চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ১৯৯০-৯৪ সালে ১,৫৯,৬-৯০০০ পাউণ্ড রাবার উৎপাদিত হবে। এর ফলে আমাদের আর

www.pathagar.com

খাবার আমদানী করতে হবে না। এর ফলে বৎসরে ১৬,৭৬,৭৮০০০ টাকা আয় হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কাজু বাদাম উৎপাদিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও পরীক্ষামূলকভাবে কাজু বাদামের চাষ করে উৎসাহ জনক ফল লাভ করা গেছে। কাজু বাদাম একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগণ যৌনশক্তি বৃদ্ধি কল্পে কাজু বাদাম ও কাজু বাদাম হতে নিষিক্ত তৈল ব্যবহার করে থাকে। কাজু বাদাম ভাঙ্গলে প্রচুর তৈল বের হয়ে আসে। এ তৈলের চিকিৎসামূলক ব্যবহার কল্পে গবেষণা করা প্রয়োজন।

অতি আশ্চর্য ও দুঃখজনক ব্যাপার যে, বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান দু'টি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে কমে যাচ্ছে। এ পণ্য দু'টি হল পাট ও চা। আমরা সবাই জানি, ১৯৪৭ সালের পর হতেই সমগ্র পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রক অর্জনকারী প্রধান পণ্য ছিল পাট। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্বিতীয় প্রধান পণ্য চা। অথচ উৎপাদনের ক্রমাগত অবহেলা ও বাজারজাতে ষড়যন্ত্রের কারণে এই দু,টি প্রধান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি তো হচ্ছেই না বরং হ্রাস পাচ্ছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ২০ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে ৬৮ লক্ষ ৪২ হাজার বেল পাট উৎপাদিত হয়েছে। অতঃপর পাটের উৎপাদন কমতে থাকে। ১৯৫০-৫১ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময়ে পাটের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় ও তদ্বারা পাকিস্তানের অর্থনীতি এত শক্তিশালী হয় যে, আজো তার সুফল পাকিস্তানীরা ভোগ করছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে দুর্বল করার মানসে সৃষ্ট একটি ষড়যন্ত্রের ফলে পাট উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। যা হোক পরবর্তী পর্যায়ে আবার ধীরে ধীরে পাটের উৎপাদন বাড়তে থাকে ও ১৯৬৯-৭০ সালে ৭৩ লক্ষ ৯১ হাজার বেল পাট উৎপাদিত হয়। ১৯৭১ সালের পর পাটের বাজার নানা ষড়যন্ত্রের মারপ্যাঁচে মারাত্মক ভাবে বিপর্যস্ত হয়। ১৯৭৫ সালের পর পাটের বাজারে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সামান্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

১৯৭৮-৭৯ সালে বাংলাদেশ ২০ লক্ষ একর জমিতে ৬৫ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন করে। লক্ষ্য করা যায় যে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হলেও দেশের প্রধান অর্থকারী ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুস্পষ্ট পিছুটান রয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে বিশ্বে মোট উৎপাদিত পাটের ৮০.১৭ ভাগ বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়েছে। অথচ ১৯৭ .৭৯ সালে এর পরিমাণ দাড়িয়েছে মাত্র ২৯ ভাগে। ১৯৭১ সালের পর পাট উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেলেও পাট বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষকগণ মারাত্মক সমস্যায় নিপতিত হয়েছে। ফলে পাটের চোরাচালানী বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ১৯৪৭ সালের পর কাঁচা পাটের অভাবে বন্ধ করে দেওয়া পাট কলগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করেও প্রচুর কাঁচা পাট বিশ্ব বাজারে রপ্তানী করেছে। একবার অন্যানা সূত্র হতে ১০ লক্ষ বেল পাট প্রাপ্তির কথা ভারত সরকার সরকারীভাবে স্বীকার করেছে। পাটের উৎপাদন ও বাজারজাত করণে এই লণ্ডভণ্ড অবস্থার ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ শুধু মাত্র পাটের কারণেই বাংলাদেশ মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল দেশ রূপে পরিগণিত হতে পারত।

পাটের বহুমুখী ও লাভজনক ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা সবাই জুটনের কথা জানি। জুটনকে আরো উন্নত করে বাংলাদেশের বস্ত্র সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। পাট দ্বারা গাড়ীর বডি, সোফাসেট, টেবিল ইত্যাদি করা হচ্ছে। এগুলো যেমন শক্ত তেমনি টেকসই। তাছাড়া পাট কাঠি দিয়ে পারটেক্স তৈরী হচ্ছে। পারটেক্সকে আরো একটু উন্নত করে বাড়ী ঘর নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যায়। পাট কাঠির দ্বারা উন্নতমানের কাগজের মণ্ড তৈরী করা যায়। এভাবে আমরা নিছক জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত পাট কাঠিদ্বারা বহু কোটি টাকা আয় করতে পারি। পাট কাঠির বৈজ্ঞানিক ব্যবহার হলে চাষীদের অর্থোপার্জনের নতুন সূত্র উন্মোচিত হবে। পাটের আবর্জনা দ্বারা উৎকৃষ্টমানের বালিশ তৈরী হয়। ১৯৬৯ সাল হতে বাংলাদেশ শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র পাটের আবর্জনা দ্বারা বালিশ তৈরীর ফরমূলা লিজ দিয়ে অর্থোপার্জন শুরু করেছে। (বৃশিয়ার বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ১৯৮২ পৃঃ ১৩)।

www.pathagar.com

পাট হতে অধুনা সুন্দর সুন্দর কার্পেট তৈরী হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো পশমী কার্পেট হতেও সুন্দর ও আরাম দায়ক হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই কার্পেটের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আমরা একটু উদ্যোগ নিলেই সস্তায় কার্পেট সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্বের কার্পেট বাজার দখল করতে পারি। বস্তার ক্ষেত্রে পাটের বিকল্প তৈরী হওয়ায় আমাদের কোন ক্ষতিই হবে না। কারণ পাটের বিচিত্র রকমের লাভজনক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পাট হতে অনেক বেশী আর্থোপার্জন করতে পারি। সুখের কথা যে নানা প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকগণ পাটের নতুন নতুন লাভজনক ব্যবহার উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের আর্থোপার্জনকারী দ্বিতীয় পণ্য হোল চা। পাটের ন্যায় চায়ের উৎপাদনও বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে।

১৮৪০ সালে বাংলাদেশে চা উৎপান শুরু হয়। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের চা মানে ও পরিমাণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে চা বাগানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তীকালে জাতীয়-করণ নীতি ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রের কারণে চা চাষের পরিমাণে ও গুণে কোন উন্নতি সাধন করা হয়নি। যাহোক ১৯৭৫ সালের পর চা উৎ-পাদনে সামান্য অগ্রগতি দেখা যায়। ১৯৭৮-৭৯ সালে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৭শ' একর জমিতে ৮ কোটি ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড চা উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সালে আবার চায়ের পরিমাণ কমে গিয়ে ৮ কোটি ৭ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ডে দাড়ায়। বিশ্বের বাজারে চায়ের চাহিদা প্রচুর। আমাদের দেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল অনাবাদী পাহাড়ী অঞ্চলে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। যথাযথ উদ্যোগ নিলেই আমরা তা হতে অন্তত দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ আয় করতে পারি।

বাংলাদেশে বর্তমানে আন্তর্জাতিকমানের উৎকৃষ্ট তামাক উৎ-পাদিত হচ্ছে। উদ্যোগ নিলেই আমরা ভবিষ্যতে তামাক রপ্তানী করে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারি।

বাংলাদেশে বেশ কিছু মূল্যবান ফসল আগাছার ন্যায় জন্মে থাকে। যেমন ধুতুরা, গাঁজা, বিষকাটালী, হাড় ভাঙ্গা লতা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

হাড়ভাঙ্গা লতার কার্যকারিততা সম্পর্কে আমার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি। শৈশবে আমার ডান হাতের হাঁড় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমার আববা গ্রাম্য কবিরাজের নিকট হতে হাড়ভাঙ্গা লতা এনে নিজের হাতে ভাংগা হাড় সেট করে লতা দিয়ে জড়িয়ে দেন। এক রাতের মধ্যেই ভাংগা হাড় জোড়া লাগে। আববার আনাড়ী সেটিং-এর জন্যই বোধ হয় দীর্ঘক্ষণ লিখতে অসুবিধা হয়। ভাংগা হাড় জোড়া লাগানোর এই মহৌষধির গবেষণা ও অর্থকরীভাবে চাষ ও ব্যবহার হওয়া বিশ্ব মানব কল্যাণে একান্তভাবেই প্রয়োজন।

আমাদের দেশে যত্রতত্র আগাছার ন্যায় ধুতুরা জন্মে থাকে। আমরা তস্কর কর্তৃক ধুতুরার ব্যবহার সম্পর্কে প্রায়ই খবর পাই। প্রকৃতপক্ষে ধুতুরা একটি মূল্যবান ওষুধরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বাংলাদেশ শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র ধুতুরা বীজের তেলের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেছে (একই সূত্র. পৃঃ ২০) মোটকথা ক্ষতিকর আগাছারূপে পরিচিত ধুতুরা বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কোটি কোটি টাকা আয় করতে পারি।

রাজশাহী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা আগাছার ন্যায় জন্মে থাকে। বাংলাদেশের বৃহত্তম মুসলিম জন গোষ্ঠীর ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে গাঁজার চাষ সুনজরে দেখা হয় না। এ সুযোগে ভারত বাংলাদেশ হতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা চোরাপথে নিয়ে বিশ্ব বাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আয় করে থাকে। কঠোর নিয়ন্ত্রণেয় মাধ্যমে গাঁজার চাষ ও বাজারজাত করলে এ খাতের আয় প্রায় শত কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

উত্তরবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শিয়ালকাটা জন্মে থাকে। শিয়ালকাটা হ'তে অতি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করে প্রচুর অর্থোপার্জন করা যায়।

এভাবে দেখা যায় বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জমিতে কিছু না কিছু জন্মে যা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অতীব লাভজনক। এ সম্পর্কে বেশী কিছু আলোচনার প্রয়োজন নেই।

এবার আমরা কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত অন্য একটি অর্থকরী পণ্য

www.pathagar.com

সম্পর্কে আলোচনা করব। সেটা হোল গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী। বাংলাদেশে কি পরিমাণ গরু-ছাগল আছে সে সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য জানা যায়নি ; তবে বৎসরে গড়ে ১ কোটি ২৫ লক্ষ খানা গরু ছাগলের চামড়া উৎপাদিত হয়ে থাকে। প্রতি দশটির একটিকে যদি জবাই করা হয় ও চামড়া সংগ্রহ করা হয়, তবে বাংলাদেশে প্রায় ১২ কোটি ৫০ লক্ষটি গরু-ছাগল আছে। প্রকৃতপক্ষে এর সংখ্যা আরো বেশী হবে। কারণ সব মৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ করা হয় না। যাহোক গরু আমাদের অর্থনীতির প্রধান হাতিয়ার। মানব সভ্যতার সেই আদিকাল হতে আজ পর্যন্ত আমরা গরু দ্বারাই কৃষি কাজ চালিয়ে আসছি। তাছাড়া চামড়া আমাদের তৃতীয় অর্থকরী ফসল। এখানেও ঘাপলা। বিশ্ব বাজারে চামড়ার নিদারুণ চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশে চামড়ার দাম ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। একটি আন্তর্জাতিক চক্রের ষড়যন্ত্রের কারণে আমাদের চামড়া শিল্প গড়ে উঠছে না। দৈনিক ইত্তেফাকের মতে ভারতীয় পুঁজিপতিদের কারসাজিতে বাংলাদেশ চামড়া বাবদ বহু কোটি টাকা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। (সম্পাদকীয় ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫/১/৮৩ ইং)। যথাযথ যত্ন নিলে চামড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ কয়েকশত কোটি টাকা আয় করতে পারে। তাছাড়া উন্নতমানের গরু যত্ন সহকারে পালন করলে আমাদের প্রোটিন ঘাটতি অনেকাংশে কমে যাবে।

বাংলাদেশের কালোজাতের ছাগল বিশ্বে সর্বোত্তম। বিশ্ব সংস্থার মতে বাংলাদেশ এই ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারে। অথচ আমাদের দেশে এই উৎকৃষ্টমানের পশু অতিশয় অবহেলার মধ্যে পালিত হয়।

বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারই একটি ক্ষুদে হাঁস মুরগির খামার। এক্ষেত্রেও চার্লস মেটকাফের 'ক্ষুদে প্রজাতন্ত্রে'র কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের হাঁস-মুরগীর পরিমাণ সম্পর্কেও কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৭৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৫১টি পরিবার রয়েছে (Housing Census Report 1973)। পরিবার প্রতি গড়ে ১০টি করে হাঁস-মুরগী থাকলে মোট ১২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫১০টি হাঁস-

www.pathagar.com

মুরগী থাকার কথা। বিশ্বের আর কোন দেশে এত অযত্নে ও অবহেলার এত হাঁস-মুরগী পালিত হয় না। সমগ্র বাংলাদেশকে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা একটি অবহেলিত হাঁস-মুরগির খামাররূপে বিবেচনা করা যায়। যেখানেই যাই, খালে-বিলে পুকুরে হাঁসের ঝাঁক আর রাস্তা-ঘাটে, বাগানে-আগানে, মাঠে ঘাটে মুরগীর বিচরণ দেখা যায়। আমাদের দেশের লোকদের হাঁস-মুরগির যত্ন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। তারা এর প্রয়োজনীয়তার কথাও চিন্তা করে না। এ দেশে বৎসরে গড়ে প্রায় দুই কোটি মুরগী মড়কে মরে থাকে। আমরা প্রায় পত্রিকায় দেখে থাকি, দলে দলে মুরগীর পাল বিনা চিকিৎসার মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতি বৎসর দুই কোটি মুরগি বাঁচানো সম্ভব হলে মুরগী প্রতি গড়ে ২০ টাকা হারে বৎসরে ৪০ কোটি টাকা আয় হবে। তাছাড়া যত্ন সহকারে প্রতিটি পরিবার হাঁস-মুরগি পালন করলে বৎসরে কত কোটি টাকার সাশ্রয় হবে তাও ভাবনার বিষয়।

বনজ সম্পদ

এতক্ষণ আমরা কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত কৃষিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার বনজ সম্পদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। বাংলাদেশে মোট ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৬০ একর জাতীয় বন এলাকা আছে। এটা মোট জমির ৯'২ ভাগ। বাংলাদেশে মোটামুটি তিন প্রকারের জাতীয় বন রয়েছে। যথাঃ পাহাড়ী বন, জোয়ার প্লাবিত বন ও শাল বন।

জেলাওয়ারী বনের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ—

চট্টগ্রাম	৭,২৯,০০০ একর
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৬,৪৫,০০০ ,,

www.pathagar.com

সিলেট	১,৯১,০৪৮ ,,
কুমিল্লা	১৮৮৭ ,,

উপরোক্ত বনভূমিকে পাহাড়ী বন বলা হয়।

খুলনা (সুন্দরবন)	১৩'২৬.০০০ একর
বরিশাল ও পটুয়াখালী (সুন্দর বনের বর্ধিত অংশ)	১৬,০০০ ,
নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়খালী ও চট্টগ্রামের চরাঞ্চল	৬৩,০০০ ,,

উপরোক্ত বনভূমিকে জোয়ার প্লাবিত বন বা ম্যানগ্রোভ বন বলা হয়।

ঢাকা	৬৪,৭৯৭ একর
মোমেনশাহী	৬৭,৪৯০ ,,
টাংগাইল	১,১৩.১৪৪ ,,
রাজশাহী	৭.০৭৪ ,,
রংপুর	৪,৭৬৪ ,,
দিনাজপুর	২৪,৭২৯ ,,

উপরেক্তে বনভূমিকে আভ্যন্তরীণ শালবন বলা হয়। (বাংলাদেশের বন সম্পদ : কৃষি ও বন বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, ১৯৮২ পৃঃ ১০)।

উপরে বর্ণিত জাতীয় বন ছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে ছোট ছোট বনাশ্রমে পরিণত করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মোট ১৩৮ কোটি ৮৩ লক্ষ নানা প্রকারের গাছ রয়েছে। মাথা পিছু গ্রামীণ গাছের পরিমাণ পনরটি। পরিকল্পনা মোতাবেক গাছের পালন করলেই বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে ছোট খাট বন রূপে গড়ে তোলা যায়। এতে কাঠের সরবরাহ বাড়বে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অতি অনাদরে জন্মে শিমুল গাছ। শিমুল গাছে শকুন, বাজ ও চিলেরা বাসা বাঁধে। আমাদে দেশে একটি কুসংস্কার আছে যে, শিমুল গাছে ভূত থাকে। এ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে গ্রামবাসীরা বাসস্থানের নিকটে শিমুল গাছ জন্মাতে দেয়না। অথচ এই শিমুল গাছ অতীব মূল্যবান সম্পদ। ম্যাচের বাক্স, চা ও বিস্কুটের প্যাকিং বাক্স তৈরীর জন্য শিমুল কাঠ অতি উৎকৃষ্ট।

www.pathagar.com

অধুনা নোয়াখালী জেলার পল্লী অঞ্চলে একমণ শিমূল কাঠ ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ শিমূল গাছকে চিরকাল মানুষ অবাঞ্ছিত মনে করে আসছে। শিমূলের তুলাও আমাদের জন্য একটি অতীব মূল্যবান সম্পদ। আমরা শৈশবে দেখেছি, কিছু অচেনা লোক এসে রয়না গাছের ছাল তুলে নিয়ে যেতো। এগুলি দিয়ে নাকি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হতো। আমরা শিশুকালে দেখেছি মরিচকে সারা বৎসরব্যাপী পোকা-মাকড় ও আদ্রতা হতে রক্ষা করার জন্য রয়নার তৈল ব্যবহার করা হতো। এটা অতি উৎকৃষ্টমানের অথচ ক্ষতিবিহীন পোকা-মাকড় রোধকারী ওষুধ। তাছাড়া রয়নার তৈল কুপিতে জ্বালানো হতো। ব্যথা সারানোর জন্য মালিশ করা হতো। সারা বাংলাদেশেই অতি অনাদরে রয়না গাছ জন্মায়। এভাবে আরো কত মূল্যবান বৃক্ষ যে বাংলাদেশে জন্মায় তার কোন খবরই আমরা রাখি না।

সেদিনই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে দুর্গম অঞ্চলে একটি ম্যাচ বাক্সের বিনিময়ে এক ঝুড়ি কমলা লেবু পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলেই দেখা যায় যে, সর্বত্রই বুনো কলাগাছ। যেখানে বুনো কলগাছ হয় সেখানে উন্নতমানের কলাগাছও হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে কমলা লেবু, আনারস ও কলা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করলে এবং টিনজাত করে রপ্তানি করলে বছরে কয়েকশ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

বৃটিশ বা পাকিস্তান আমলে আমাদের বনজ সম্পদের প্রতি যথাযথ সময় নজর দেয়া হয়নি। ১৯৪৭-৪৮ সালে এদেশের বনোন্নয়নের জন্য মাত্র ষোল হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে এখান থেকে আয় হয়েছিল ২ কোটি ৫২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। যা হোক অধুনা বনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দিকে বেশ নজর দেয়া হচ্ছে। ১৯৮০-৮১ সালে বন বিভাগ উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে ১২ কোটি ৩১ লাখ টাকা এবং আয় হয়েছে ২৮ কোটি ২০ লাখ টাকা।

আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই প্রচার করা হচ্ছে যে, রাস্তার পাশে ফলের গাছ লাগানো হোক। কিন্তু কেউই তার প্রতি বিশেষ কর্ণপাত করছে না। ডেমরা পুল হতে নরসিংদি যাওয়ার রাস্তার

www.pathagar.com

কিছু অংশ বা ঢাকা সেনানিবাসের মূল রাস্তার দুপাশ দেখলেই বুঝা যে, আমরা রাস্তার পাশে ফলের গাছ চাষ করে কয়েকশ' কোটি টাকা আয় করতে পারি। জাপানের গ্রামের বাড়ীগুলোর কোনটিতে উঠান দেখেনি। আবাদযোগ্য প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে জাপানীরা ফসল ফলিয়ে থাকে।

আমাদের দেশে আরেকটি বনজ সম্পদ রয়েছে। সেটা হচ্ছে মৌমাছি। সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর মৌচাক হয়। বছরে প্রায় ৭ হাজার মণ মধু ও তিন হাজার মণ মোম সুন্দরবন এলাকা হতে সংগৃহীত হয়ে থাকে। তাছাড়া মধুপুর বন হতেও প্রচুর মধু সংগৃহীত হয়ে থাকে। ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে মোমেনশাহী কারাগারে অবস্থানকালে জেলের অভ্যন্তরে বড় বড় কয়েকটি মৌচাক দেখেছিলাম। সেগুলো হতে মধু সংগ্রহ করলে প্রায় মণ খানেক মধু পাওয়া যেত। আমরা প্রতি গৃহেই মৌমাছির চাষ করতে পারি।

একথা সত্য যে, বনজ সম্পদে আমরা সমৃদ্ধ নই। একটি দেশের চারভাগের এক ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। আমাদের আছে ১০ ভাগের একভাগেরও কিছু কম। তবে প্রতিটি বাড়ীতে রাস্তার পাশে ও পুকুর পাড়ে প্রচুর গাছ লাগিয়ে আমরা আমাদের বন বৃদ্ধি করে আয়ের নতুন সূত্রেরও উন্মোচন করতে পারি ও প্রতিবেশে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি।

প্রবন্ধের বর্তমান অংশে আমরা বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের উপরি ভাগে উৎপাদিত সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ পর্যায়ে আমরা দু'টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব। বিষয় দুটি হলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভৌগলিক অবস্থান। এ দু'টিকেও আমরা অর্থোপার্জনের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতে পারি।

বাংলাদেশ একটি উৎকৃষ্ট ধরনের পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা যায়। পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্যবহারযোগ্য বেলাভূমি বাংলাদেশে অবস্থিত। কক্সবাজার হতে টেকনাফ পর্যন্ত দীর্ঘ বেলাভূমির ডানে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি আর বামে ছোট বড় পাহাড়ের চুড়া ও সবুজ বনশ্রেণীর নয়নাভিরাম দৃশ্য সত্যি অপূর্ব। পাহাড়, বন

www.pathagar.com

ও সমুদ্রের এমন সমাবেশ কমই আছে পৃথিবীতে। কার্তিক অগ্রায়ণ মাসে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পথে দেখা যায় বন্য হাতীর পাল। কোন কোন সময়ে যাত্রাবাহী বাস ও অন্যান্য যানবাহনকে থামতে হয় বন্য হাতীদের পথ দেয়ার জন্য। এহেন দৃশ্য পৃথিবী আর কোথায় আছে? বান্দরবন জেলায় মানব সভ্যতার আদিমস্তর আজো বিরাজ-মান। পৃথিবীর অন্যতম প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী লেভীস্ ট্রস অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চল আধুনিক নৃ-বিজ্ঞানের যাদুঘর (মিউজিয়াম) রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এ দেশের উপজাতীয়দের জীবনযাত্রা ইউরোপ আমেরিকার পর্যটকদের জন্য একটি অতীব আকর্ষণীয় বস্তু হতে পারে।

মানুষের তৈরী তৈরী পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ বাংলাদেশে অবস্থিত। কাপ্তাই হ্রদের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হ্রদ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। দু'দিকে সুউচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী, তাতে নয়ন জুড়ানো সবুজের সমাহার আর মাঝখানে বিশাল কাপ্তাই লেক ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। প্রকৃতির রাণী তার শ্রেষ্ঠতম সাজে সজ্জিতা হয়ে আবির্ভূতা হয়েছে যেন বাংলাদেশে। কিন্তু আমরা এরূপকে সঠিভাবে ব্যবহারযোগ্য করতে পারছি না। এর সংবাদ প্রাকৃতিক রূপ পিপাসুদের নিকট পৌঁছাতেও পারছি না সঠিভাবে।

বাংলাদেশে কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান আছে আছে। যেমন বগুড়ার মহাস্থান গড়, রাজশাহীর পাহাড়পুর, দিনাজপুরের রাম সাগর ও কান্তনন্দির, কুমিল্লার ময়নামতি, ঢাকার লালবাগ দুর্গ, খুলনার খানজাহান আলীর দরগা, ফরিদপুরে চাঁদ রায়ের রাজধানী ইত্যাদি। এসব স্থান বিদেশী পর্যটকদের জন্য অতিশয় আকর্ষণীয় দর্শন কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হতে পারে। এগুলোর আদিরূপ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সবচেয়ে মূল্যবান স্থান হলো সুন্দর বন। সুন্দর বনের বৈশিষ্ট্য হলো জোয়ারের সময় অসংখ্য খালের মাধ্যমে এ বনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নৌকাযোগে যাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্য কোন গহীন বনে যাতায়াত ব্যবস্থার এমন সুযোগ নেই। সুন্দর বনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে একই সময়ে হরিণ,

www.pathagar.com

বাঘ ও কুমির দেখতে পাওয়া যায়। জল ও স্থলের রাজকীয় প্রাণীদের এরূপ একত্র সমাবেশ পৃথিবীর খুব কম স্থানেই আছে। তাছাড়া আছে জোয়ার ভাটার খেলা, মাছ মারা ও মধু সংগ্রহের অফুরন্ত সুযোগ।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে সঠিকভাবে গড়ে তুললে বছরে আমরা কয়েক শত কোটি টাকা আয় করতে পারি। পর্যটন শিল্পে উন্নত দেশসমূহের একটি করে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র আছে। বাংলাদেশেরও তেমনি একটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে, যা সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করবে। সুন্দর বনে সে কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। সুন্দরবন অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এসব দ্বীপের একটিকে এজন্য ব্যবহার করা যায়। যার আয়তন হবে দশ থেকে পনর বর্গমাইল। উক্ত দ্বীপ হতে সমস্ত বাঘকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে হবে। প্রচুর পরিমাণে বেজী ও গুই সাপ পালনের মাধ্যমে উক্ত দ্বীপ হতে সাপ তাড়াতে হবে। উক্ত দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে হরিণ পালন করতে হবে। উক্ত দ্বীপে যে কোন ধরণের প্রাণী হত্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। পর্যটকদের বসবাসের জন্য আধুনিক সুবিধাসহ বাংলো তৈরী করতে হবে। শিশুকাল হতেই হরিণদের মানুষের হাত হতে খাবার গ্রহণ করতে শিখাতে হবে। পর্যটকগণ যাতে নিজ হাতে বন্য হরিণদের খাবার খাওয়াতে পারে। হরিণ, বানর ও মধু সমৃদ্ধ এ দ্বীপের চারপাশে মৎস্য শিকারের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। দ্বীপের পাশে অন্য একটি দ্বীপে সুন্দর বনের রাজা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। বাঘশূন্য দ্বীপ হতে শক্তিশালী দুরবীনের সাহায্যে যাতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে বিচরণরত বাঘ দেখা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। হরিণের লোভে মাঝে মাঝে বাঘেরা নদী পার হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কোন পর্যটক যদি এ দৃশ্য দেখতে পারে তা তার জীবনে সবচেয়ে সুখকর স্মৃতি হয়ে থাকবে। কয়েক হাজার বন্য হরিণের এই অভয়াশ্রম গড়ে তোলা গেলে এবং উক্ত দ্বীপে নিরাপদে বিদেশী পর্যটকদের নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবন যাপনে নিশ্চয়তা করতে পারলে হরিণ, বানর, কুমির,

www.pathagar.com

মৎস্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্র পৃথিবীর সর্ব দেশের পর্যটকদের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণের স্থান হবে। এ কেন্দ্রের আকর্ষণে আগত পর্যটকদের বাংলাদেশের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের প্রতিও আকর্ষণ করা যাবে। এভাবে বাংলাদেশ তার পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারবে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানও এদেশের অর্থোপার্জনের একটি মূল্যবান সূত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এবার এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাংলাদেশের অবস্থানের অর্থনৈতিক সুবিধা

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থাও আমাদের একটি মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশের পূর্বদিকে মিজোরাম, মনিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য; উত্তর-পূর্ব কোণে মেঘালয় ও অরুণাচল; উত্তরে আসাম, ভূটান ও সিকিম এবং উত্তর পশ্চিমে, পশ্চিম বংগের কিয়দংশ ও নেপাল অবস্থিত। বর্ণিত রাজ্য সমূহের মিলিত আয়তন তিন লক্ষ বর্গ মাইলেরও বেশী। এ বিশাল এলাকা বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যবর্তী একটি সরু করিডোরের মাধ্যমে কলিকাতা বন্দরের সাথে সংযুক্ত। এসব রাজ্যের কোন কোন স্থান কলিকাতা হতে তিন হাজার মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত। তবে কোন স্থানের দূরত্ব এগারোশত মাইলের নীচে নয়। অথচ এসব রাজ্য চট্টগ্রাম বা মঙ্গলা বন্দর হতে বড় জোর পাঁচশত মাইলের মধ্যে অবস্থিত। মিজোরাম হতে চট্টগ্রাম বন্দর খুব বেশী হলেও ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। অথচ মিজোরামকে প্রায় চার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করতে হয়। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে যেমন ভারত মহাসাগরের তেরশত মাইলের ব্যবধান করাচী বন্দরে বাংলাদেশের সকল ব্যবসা বাণিজ্যের চাবি কাঠি আবদ্ধ ছিল এবং এর ফলে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্ম কাণ্ডে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবস্থান করছিল, তেমনি প্রায় তিন হাজার মাইল ব্যাপী বাংলাদেশ সীমান্তের ব্যবধানে অন্তত সাতটি রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিদারুণ শিথিলতার সৃষ্টি করেছে। ১৯৪৭ সালের পরে এসব রাজ্যের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থমকেই যায় নি, পিছিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দরগুলিকে এসব রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা যায়। অন্য দেশের সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য অব্যাহত রাখার নজির ইউরোপের কয়েকটি দেশেই রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পোল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপের কয়েকটি দেশ পোল্যাণ্ডের সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে নিজেদের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে থাকে। পোল্যাণ্ডের বন্দরগুলি কয়েকটি দেশের সমুদ্রগামী বাণিজ্য জাহাজ নিজেদের বন্দররূপে ব্যবহার করে। বিনিময়ে তারা পোল্যাণ্ডকে বন্দর ভাড়া দিয়ে থাকে। তাছাড়া বন্দরের গুদাম ভাড়া, পরিবহন শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদি বাবদ এসব দেশ পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় তহবিলে প্রচুর অর্থের যোগান দেয়। এ ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন পোল্যাণ্ড আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধা পায়, তেমনি এসব বন্দর ব্যবহারকারী দেশগুলিও উপকৃত হয়। বাংলাদেশ তার পূর্ব ও উত্তর দিকে অবস্থিত রাজ্যগুলিকে স্বীয় সামুদ্রিক বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দান করতে পারে। এর ফলে চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দর প্রতি বছর অতিরিক্ত কয়েক লক্ষ টন মালের হ্যাণ্ডলিং করতে পারে। এ ব্যবস্থা সম্ভব হলে বন্দর ভাড়া বাবদ বাংলাদেশ প্রতি বছর কয়েক শত কোটি টাকা আয় করতে পারে। তছাড়া পরিবহণ শ্রমিকরাও কয়েক শত কোটি টাকা আয় করতে পারে। বন্দর হতে সীমান্ত পর্য্যন্ত এসব রাজ্যের মাল পরিবহণের জন্য উন্নতমানের রাস্তা ও মাল বাহণের জন্য প্রচুর ট্রাকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে। দেশের আভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী পরিবহণ মালিক শ্রেণী গড়ে উঠবে। মোট কথা বন্দর ভাড়া, রাস্তা ভাড়া, পরিবহণ ভাড়া ও শ্রমিকের মজুরী মিলিয়ে এখাতে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রতি বছর অন্তত এক হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে।

যেহেতু উপরিউক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিদেশী রাষ্ট্র জড়িত আছে, সেহেতু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এটা বিবেচনা করতে হবে। সর্ব প্রথম বিবেচনা করতে হবে, এমন একটি "অর্থনৈতিক জোন" গড়ে তুলতে গিয়ে বর্তমানে বা সুদূর ভবিষ্যতে কোন ক্রমেই যেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সমস্যা সৃষ্টি না হয়। আবার বাংলাদেশও যেন মোড়লী মনোভাবে আক্রান্ত না হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মনোভাব হওয়া উচিৎ শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে সেবা দান করা। এসব দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদির ব্যাপারে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ ও নিস্পৃহ থাকতে হবে এবং এ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। মোট কথা বাংলাদেশ যদি স্বীয় আচরণের মাধ্যমে এসব রাজ্যের জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে, তবে নিশ্চয়ই আর্থিক দিক দিয়ে অতিশয় লাভজনক সেবাদানের এ দায়িত্বটি পেতে পারে। এভাবে আমরা আমাদের ভৌগলিক অবস্থানকে আর্থিক আয়ের সুত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

www.pathagar.com

পানি সম্পদ

আমাদের প্রবন্ধের বর্তমান পর্বে বাংলাদেশের পানি সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রবন্ধের প্রথম দিকে বাংলাদেশের পুকুর ও দীঘির সংখ্যা ও আয়তন, বিল হাওরের পরিমাণ ও আয়তন এবং নদীসমূহের মোট আয়তন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। পানি সম্পদ দুই প্রকার। পানি ও পানিতে উৎপন্ন সম্পদ।

বাংলাদেশে তিন প্রকারের পানি আছে। যথা :—ভূ-পৃষ্ঠের মিষ্টি পানি, ভূ-গর্ভের মিষ্টি পানি ও সামদ্রিক লোনা পানি। মিষ্টি পানি প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই নদ-নদীর কথা আসে। বাংলাদেশকে নদী মাতৃক দেশ বলা হয়। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল ও নালা ঝোরাই এদেশের বৈশিষ্ট্য। বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের নদীসমূহকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা : পদ্মা ও তার পরিবার, যমুনা ও তার পরিবার এবং মেঘনা ও তার পরিবার। এছাড়া আরো বহু ছোট-খাট নদী আছে যা এসব পরিবারের সদস্য নয়। যেমন—কর্ণফুলী, ফেনী, মহেশখালী নদী ইত্যাদি।

পদ্মা নদী তিব্বতের মানস সরোবর হতে উৎপত্তি লাভ করে নেপালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। পদ্মা ভারতের ভিতর ১৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করে রাজশাহী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হতে প্রায় ৯০ মাইল বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুষ্টিয়া জেলার উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। গোয়ালন্দের নিকটে যমুনার সাথে মিলিত হয়ে পদ্মা নাম নিয়ে চাঁদপুরের নিকটে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে এবং মেঘনা নামে বংগোপসাগরে পড়েছে। এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পদ্মা শুকনো মওসুমে বাংলাদেশের তৃতীয় নদীরূপে বিবেচিত হয়। ফারাক্কা তৈরীর বহু পূর্বেই যমুনা ও মেঘনার পরে পদ্মার প্রবাহের স্থান। এ প্রসংগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও বিশ্ব খ দ্য সংস্থার উপদেষ্টা জনাব হারুন অর রশীদ বলেন, "In 1956 for exa-

www.pathagar.com

mple on the 31st of May the discharge of the Brahmaputra-Jamuna was 9,45,000 cusecs, and that of Ganges only 151,360 cusecs" (Haroun Er-Rashid. A systematic Regional Geography and its develepment planning Aspectas, P 39).

অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ৩১শে মে তারিখে ব্রহ্মপুত্র যমুনা প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৯৪৫.০০০ কিউ:সক এবং গংগার প্রবাহের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫১,৩৬০ কিউসেক। বাংলাদেশের আভ্যন্তরে মহানন্দাই একমাত্র নদী যা পদ্মার প্রবাহে যোগান দেয়। পদ্মার শাখা নদীগুলোর মধ্যে ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ, কুমার নবগংগা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

যমুনা বাংলাদের প্রধান নদী। মহাচীনভুক্ত হিমালয়ের কৈলাশ পর্বতমালা হতে উৎপন্ন হয়ে শান পো নামে তিব্বতের মধ্যদিয়ে ১১ শত মাইল অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করেছে। আসামে এ নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র। রংপুর জেলার কুড়িগ্রামের নিকট ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ও মোমেনশাহী জেলার দেওয়ানগঞ্জ পর্যন্ত এ নামেই প্রবাহিত হয়েছে। দেওয়ানগঞ্জে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রধান শাখা যমুনা নামে পাবনা, টাংগাইল ও ঢাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে পদ্মা নামে এগিয়ে গেছে। প্রস্থে ও পানির প্রবাহে যমুনা বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী। বাংলাদেশে যমুনা নদীর দৈর্ঘ্য ২৬৬'৬৭ কিলোমিটার। বর্ষাকালে এ নদীর প্রস্থ হয় কমপক্ষে ৩'৩৩ কিলোমিটার এবং কোথায়ও কোথায়ও প্রস্থের পরিমাণ হয় ৬'৬৭ কিলোমিটার। বিশেষজ্ঞদের মতে যমুনার প্লাবনের পরিমাণ পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলোর সমান। যমুনা নদীতে সর্বোচ্চ প্লাবনের পরিমাণ হলো ২৫ লাখ ১৯ হাজার সি, এফ, এস। (সেকেণ্ডে ঘন ফিট) আর মিসিসিপি নদীতে সর্বোচ্চ প্লাবনের পরিমাণ হোল ২০ লাখ ২০ হাজার সি, এফ, এস।

(Dr. M. Shahjahan, chairman, Deptt. of water Resources Engineering, Bangladesh University of Engineering & Technology, Dhaka : Studies on Co-operation for Development in South Asia. P-5).

www.pathagar.com

যমুনা নদী বর্ষাকালে দৈনিক ১২ লাখ টন পলি বহন করে আনে। যমুনা নদীকে প্রবাহ দানকারী নদীগুলোর মধ্যে তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া ও বড়ালের নাম উল্লেখযোগ্য। যমুনার শাখা নদীগুলোর মধ্যে ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা প্রধান।

মেঘনা নদী নাগা মনিপুর জল বিভাজিকার দক্ষিণ ভাগে উৎপন্ন হয়ে বরাক নামে আসামে প্রবাহিত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয়ে সিলেট জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভৈরবের নিকটে পুরানো ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। মে মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত মেঘনার প্রবাহের পরিমাণ হলো গড়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কিউসেক।

পদ্মার অববাহিকায় বসবাসকারীগণ বছরে মাথা প্রতি ১৩০৬ ঘন মিটার, যমুনা অববাহিকার অধিবাসীগণ বার্ষিক মাথা প্রতি ১১৯০২ ঘন মিটার ও মেঘনা অববাহিকার অধিবাসীগণ ৪১১১ ঘন মিটার পানি পেয়ে থাকে (Dr. M. Shahjahan : Studies on Co-operation for Developmen in South Asia. P-2)

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা মিলিতভাবে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বর্ষাকালে এই মিলিত প্রবাহের প্রস্থ প্রায় ৯১.৬৭ কিলোমিটারে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় ২৫০টি নদী নালা রয়েছে যাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আজো সংগ্রহ করা হয়নি।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, পানি কখনো বাংলাদেশের জন্য সমস্যা নয়—এটা একটি মূল্যবান সম্পদ (Dr. Nafiz Ahmed : An Ecnomic Geography of East Pakisan. P-12)।

এ প্রসঙ্গে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ বলেন, বাংলাদেশের নদ নদীর মিষ্টি পানি এমন একটি সম্পদ যে, এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগও ফসল ফলানোর জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না (Dr. W J. Blommenstela Irrigation, 1952, P 212).

পানি সম্পদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কায়েম করতে হলে খাদ্যের ঘাটতি দূর করতে হবে। পানির যথাযথ প্রাপ্যতা ও

www.pathagar.com

ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রাণ পানি সম্পদ নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। এ সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে।

ফারাক্কা ও বাংলাদেশের পানি সম্পদ

বাংলাদেশের পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও যথাযথ ব্যবহারের উপর ফারাক্কার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশ্বের স্বীকৃত আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী কোন দেশই একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক নদীর পানি প্রত্যাহার করতে পারে না। ইউরোপের দানিয়ুব ও আফ্রিকার নীল নদ বহুজাতিক সহযোগিতা ও উদ্যোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায়ও এরূপ সহযোগিতার উদাহরণ রয়েছে। ভারত একতরফাভাবে সিন্ধু নদীর পানি ভাক্‌রা খালে প্রত্যাহার করতে পারেনি। পাকিস্তানের পানি সরবরাহের পরিমাণ অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত ভারত ভাক্‌রা বাঁধ চালু করতে পারেনি। পাকিস্তানের নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যয় ভারতকেই বহন করতে হয়। অথচ ভারত ১৯৭৪ সালে একতরফাভাবে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করা শুরু করে। ভারত গঙ্গাকে দ্বিজাতীয় নদীরূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করে। অথচ গঙ্গা নদীর মালিক চারটি জাতি। উৎস্থলে চীন ও সাগর সঙ্গমে বাংলাদেশ এবং মাঝ পথে ভারত ও নেপাল। গঙ্গার ক্ষেত্রে ভারত অন্য কোন দেশ বা জাতিসংঘের মধ্যস্থতা মানতে রাজী হয় না, যা সিন্ধুর ক্ষেত্রে করেছিল। একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার ও আভ্যন্তরীন চাপের মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে ভারত বাংলাদেশকে ফারাক্কার ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। ১৯৭৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা অভিযান করিয়ে, জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়ে বাংলাদেশ আবার দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

১৯৮২ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশ ভারতের সাথে একটি সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করে। উক্ত সমঝোতা পত্রে তিনটি

www.pathagar.com

বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। যথা ঃ—(১) ফারাক্কায় যে পানি আছে তা বন্টনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, (২) ফারাক্কায় পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে এবং (৩) ফারাক্কার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য উভয় পক্ষের প্রস্তাবের কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে ১৮ মাসের মধ্যে রিপোর্ট করতে হবে। অত্যন্ত বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের কয়েকদিন পরেই ভারতের কৃষি মন্ত্রী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, ফারাক্কায় পানি বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় নেপালকে কখনো অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আর নেপালে জলাধার নির্মাণই হলো বাংলাদেশের প্রস্তাব যা সমঝোতাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়—ফারাক্কায় কি পরিমাণ পানি আছে, যা বন্টনযোগ্য নয়? ১৯১৬ সালের ৩১শে মে তারিখে পাকশী দিয়ে ১ লক্ষ ৫১ হাজার কিউসেক পানি প্রবাহিত হয়েছে। (Haroun Er-Rashid : P-41 and also documented by water supply paper 19, EPWAPDA, DHAKA)। এবং একই সময়ে হুগলী নদীতে যে প্রবাহ ছিল তাতে কলিকাতা বন্দর নাব্য ছিল। অথচ ১৯৮২-৮৩ সালে একই সময়ে ফারাক্কায় মোট পানি প্রবাহের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৬৫ হাজার কিউসেক (Memorundam of understanding, Annexure A দ্রঃ)। গঙ্গার উৎস মুখে বা প্রবাহ পথে এমন কি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে যার ফলে গঙ্গার প্রবাহ অন্ততঃ দুই লক্ষ কিউসেক হতে (পাকশী ও কলিকাতায় মিলিত প্রবাহের পরিমাণ) মাত্র ৬৫ হাজার কিউসেকে নেমে এসেছে? এমন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কোন খবর পাওয়া যায়নি। সুতরাং গঙ্গার প্রবাহের এই মারাত্মক অবনতির জন্য ভারত কর্তৃক উজানে পানি প্রত্যাহারকেই দায়ী করা যায়। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের বহু পূর্বেই পানি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা ১৯৫৬ সালের শুকনো মওসুমে পদ্মা ও যমুনার প্রবাহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, পদ্মা ও যমুনার প্রবাহের হার হলো প্রায় ১ ঃ ৯। অথচ ঐ বছরের বর্ষাকালের পানি প্রবাহের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্ষা যত বেশী ঘনীভূত হয়েছে পদ্মার প্রবাহের হার তত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এক পর্যায়ে পদ্মার প্রবাহের পরিমাণ যমুনা অপেক্ষা

www.pathagar.com

অনেক বেশী হয়েছে। আবার শুকনো মওসুমে পদ্মার প্রবাহ যমুনার নয় ভাগের এক ভাগে দাঁড়িয়েছে। পদ্মার প্রবাহে এই মারাত্মক তারতম্যের কারণ কি? কারণ হলো, ১৯৫৬ সালের পূর্ব হতেই ভারত শুকনো মওসুমে গঙ্গার উজান হতে পানি প্রত্যাহার শুরু করে, যার ফলে যমুনার সাথে পদ্মার প্রবাহের আনুপাতিক হার মারাত্মকভাবে কমে যায়। আবার বর্ষা আসলেই গঙ্গার উজানে পানি প্রত্যাহার বন্ধ হয়ে যায় এবং পদ্মা তার স্বাভাবিক প্রবাহে প্রবাহিত হয়, যার পরিমাণ যমুনার চেয়ে কখনো কখনো অধিকতর। ফারাক্কা নির্মাণের পর গঙ্গার উজানে পানির সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যাহারও বাড়ে। এই প্রক্রিয়ার পরিণতিতে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে যে গঙ্গার প্রবাহের পরিমাণ ছিল অন্ততঃ ২ লক্ষ কিউসেক, সেই গঙ্গার প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় গিয়ে মাত্র ৬৫ হাজার কিউসেক। ১৯৮২ সালের সমঝোতায় ৬৫ হাজার কিউসেক পানির অংশ প্রাপ্তির শেষ সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। ফারাক্কার প্রবাহ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ফারাক্কায় নয়, গঙ্গায় পানি আছে কিনা সেটাই বিবেচনা ও বন্টনের দাবী করাই স্বাভাবিক।

ফারাক্কার পানি যে উজানেই প্রত্যাহারিত ও নিঃশেষিত হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণও তা অনুধাবন করছে। তাই তাদের বুদ্ধিজীবীগণ আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বলেন, "ফারাক্কায় জল আসবে কোত্থেকে, সব জলইতো উপর থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে"।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ঃ ফারাক্কা ও দেশপ্রেম, দৈনিক ইত্তেফাক ১৩/১০/৮২ইং)।

যাহোক, আপাতদৃষ্টিতে ফারাক্কার কারণেই বাংলাদেশ শুকনো মওসুমে অন্ততঃ ১ লক্ষ ১২ হাজার কিউসেক পানি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আর হুগলি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির পরিবর্তে দিন দিন কমেই যাচ্ছে। এবার পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৯৮২ সালের সমঝোতা পত্রানুযায়ী ফারাক্কার পানি প্রবাহের বৃদ্ধির যে দু'টি প্রস্তাব রয়েছে, তার একটিতে নেপালে জলধারা নিমাণ করে বর্ষার পানি সংরক্ষণ করে শুকনো মওসুমে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরের কয়েকদিনের মধ্যে ভারত

www.pathagar.com

সরকারীভাবে বাংলাদেশের উপরোক্ত প্রস্তাব নাকচ করেছে। এখন ভারতের কাছে থাকে শুধুমাত্র তার নিজস্ব প্রস্তাব। অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে সংযোগ খাল কেটে যমুনার পানি নিয়ে ফারাক্কা হতে ৩০/৪০ মাইল উজানে গঙ্গায় ফেলা বাংলাদেশের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখান করে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিশন কিসের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করছেন এবং ২৪ই ডিসেম্বরের ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পর অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে কি রিপোর্ট প্রদান করবেন এ সম্পর্কে বাংলাদেশের জনমনে ব্যাপক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

গত ২২শে জানুয়ারী সাপ্তাহিক "হলিডে" পত্রিকায় জনাব সিরাজুল হোসেন খান এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে, জলাধার নির্মাণ সংক্রান্ত বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রায় বাতিল হয়ে গেছে এবং সংযোগ খালের সম্ভব্যতা নির্ণয় করা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে একাজে তহবিলের ব্যবস্থা করেছে। তিনি লিখেছেন ঃ

"Knowledgeable sources report that the world Bank has informed both India and Bangladesh of its readiness to place funds for the feasibility study of the link canal.. তিনি আরো বলেছেন, "Similarly, had India and Bangladsh not been agreeable to the idea or program for a feasility study of the link canal. The world Bank would not have ventured to offer funds for it"

জনাব সিরাজুল হোসেন খান লিখেছেন যে, বিশ্ব ব্যাংক নেপালে জলাধার নির্মাণের সম্ভব্যতা পরীক্ষার জন্য অর্থ প্রদানেও রাজী ছিল। আমাদের ধারণা গঙ্গার পানি সমস্যা সমাধানে নেপালে জলাধার নির্মাণের ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাংক অনেক বেশী আগ্রহী। কারণ অত্র দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে যৌথ পরিকল্পনার ব্যাপারেই গণতান্ত্রিক বিশ্ব বেশী আগ্রহী। তবুও বাংলাদেশের জন্য অতন্ত ক্ষতিকর পরিকল্পনায় বিশ্ব ব্যাংক কেন অর্থ সরবরাহ করছে? স্বাভাবিক ভাবে মনে করা যেতে পারে শুধুমাত্র এ জন্যই অর্থ চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার আজ পর্যন্ত এই প্রতিবেদনের কোন প্রতিবাদ করেনি। পার্লামেন্টে ভারতীয় মন্ত্রীর

www.pathagar.com

বক্তব্য, "হলিডে" পত্রিকার প্রতিবেদন ও বাংলাদেশ সরকারের নীরবতা সংযোগ খালের ব্যাপারে শংকা বৃদ্ধি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে সংযোগ খালের ফলে বাংলাদেশ কি পরিমাণ সম্পদ হতে বঞ্চিত হবে ও কি পরিমাণ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংযোগ খাল তার ও প্রতিক্রিয়া

ফারাক্কায় পানির পরিমাণ বৃদ্ধি কল্পে ভারত যমুনার সাথে গঙ্গার সংযোগ ঘটানোর প্রস্তাব করেছে। ভারতের প্রস্তাব হলো, আসামের যোগীগোপা হতে একটি খাল কেটে ফারাক্কার ৩০/৪০ মাইল উজানে সুবর্ণ সিঁড়িতে গঙ্গায় যমুনার পানি ফেলার। এ খালের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৯২ মাইল। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এ খাল ৬৪ মাইল অতিক্রম করবে। খালের প্রস্থ হবে আধ মাইল আর গভীরতা হবে ৩০ ফুট। সংযোগ খাল ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ১০,৯৮০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সংযোগ খালের ফলে ভারতের কি উপকার হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ভারতের বক্তব্য অনুযায়ী শুকনো মওসুমে কমপক্ষে ১ লাখ কিউসেক পানি যমুনা হতে গঙ্গায় স্থানান্তর করা হবে। এ পানির ৪০ হাজার কিউসেক কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা ও সুন্দরবনের ভারতীয় অংশের লবনাক্ততা দূর করার জন্য হুগলী নদীতে প্রবাহিত করা হবে। বাকী পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা হবে।

সংযোগ খালের উৎপত্তি ও গঙ্গার সাথে সংগম স্থলে পানি-বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে ১ কোটি কিলোওয়াট বিদুৎ উৎপত্তি করা হবে এবং তদ্বারা আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের জ্বালানি ঘাটতি পূরণ করা হবে।

বিহারের পাটনা ও আসামের ডিব্রুগড়ের মাঝে নৌসংযোগ স্থাপন করা হবে। মাঝারি ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ ও গান বোটগুলি

www.pathagar.com

অনায়াসে এখানে চলাচল করতে পারবে। সংযোগ খালের পানি দ্বারা ভারতের দুই কোটি একর জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে।

সংযোগ খালের ফলে বাংলাদেশের কি ক্ষতি হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ বিভাগের প্রধান ডঃ মোঃ শাহজাহান এক প্রতিবেদনে সংযোগ খালের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ক্ষতির প্রকার ও পরিমাণ নির্ণয় করেছেন। তার মতে খাল খননের ফলে বাংলাদেশের ২৫২ বর্গ মাইল বা ১ লক্ষ ৬১ হাজার ২৮০ একর আবাদী জমি নষ্ট হবে। খাল যদি শুধু মাত্র আবাদী জমির উপর দিয়ে যায়, তবে ১২০৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার জমি নষ্ট হবে। এতে ৫ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ খালের ফলে ফসল খাতে বার্ষিক লোকসান হবে ৮৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া ১১টি নদীর গতি পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এসব নদীর প্রবাহ সংযোগ খালে পতিত হবে। নদীগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

নদীর নাম		সর্বনিম্ন প্রবাহের পরিমাণ (প্রতি সেকেণ্ডে ঘনফুট) বা কিউসেক			
১।	ধরলা	৬৭৬৫	,,	,,	,,
২।	তিস্তা	৩৬০০০	,,	,,	,,
৩।	ঘাগট	২৮৩	,,	,,	,,
৪।	বুড়ী খোড়া-চীলকী	৪৬৩	,,	,,	,,
৫।	দোনাই-চাড়াল কোটা	১৭৮৫	,,	,,	,,
৬।	করতোয়া (খড়খড়িয়া)	৩৯০	,,	,,	,,
৭।	যমুনা (ব্রহ্মপুত্র যমুনা নয়)	৩৪১৬	,,	,,	,,
৮।	আত্রাই	২৮৬৬	,,	,,	,,
৯।	পুনর্ভবা	২৫৮৮	,,	,,	,,
১০।	টাঙন	৭২৩	,,	,,	,,
১১।	মহানন্দা	২৬২৬৩	,,	,,	,,

(Dr. M. Shahjahan : Impact of Reduce low flow of Major rivers of Bangladesh, Aug. 22, 1980 P 6—8)

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে উপরে বর্ণিত নদীগুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলি খাল-বিল ও নদী-নালার পানি সংযোগ খালের মধ্য দিয়ে ভারতের দিকে প্রবাহিত হবে। বর্ণিত নদীগুলিসহ এদের সংখ্যা অন্তত ১৯টি হবে, (University of Dhaka: Bangladesh in Map. River Systems, P 12 দ্রঃ)।

সংযোগ খালের আলোচনায় এসব নদ-নদীর কথা উল্লেখিত হচ্ছে না। ভারত বলছে যে যমুনা হতে কমপক্ষে ১ লক্ষ কিউসেক পানি নেবে। অথচ সংযোগ খালের গমন পথে যেসব নদীর গতিপথ রুদ্ধ ও গতি বদলিয়ে ভারতে ফারাক্কা অভিমুখে প্রবাহিত হবে, সেসব নদীসমূহের মিলিত প্রবাহের পরিমাণ কমপক্ষে ৮১৫৪২ কিউসেক। তাহলে ভারত সংযোগ খালের মাধ্যমে এক লক্ষ কিউসেকের কথা বলে প্রায় দুই লক্ষ কিউসেক পানি নিয়ে যাচ্ছে।

উপরে বর্ণিত লোকসান ছাড়াও খালের প্রতিক্রিয়ায় কি কি ক্ষতি হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। খালের দক্ষিণ পাড়ে বেড়ী বাঁধ থাকায় উত্তরের পানি দক্ষিণে প্রবাহিত হতে পারবে না। ফলে প্রতি বর্ষায় খালের উত্তর পাড়ে অবস্থিত রংপুর ও দিনাজপুর জেলা মারাত্মকভাবে প্লাবিত হবে। বর্ষার মওসুমে শুধুমাত্র যমুনা নদীর প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ লাখ ৬০ হাজার কিউসেক। আমাদের বর্ণিত ১১টি নদীর মিলিত প্রবাহের পরিমাণ হয় ৬৭৪৫২০ কিউসেক। তাছাড়া অত্র অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত অন্ততঃ ১৯টি নদী বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে উঠে। হিমালয় অঞ্চলে অবিরল বৃষ্টি ও বরফগলা পানি অত্র জেলাদ্বয়ের নদী নানা খালবিল এবং বিস্তৃর্ণ মাঠ দিয়ে দক্ষিণের নিম্ন ভূমির দিকে ধাবিত হয়। এ সবের গতি-পথ সংযোগ খালের বেড়ীবাঁধ দিয়ে রুদ্ধ করে দিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রতি বছর বৈশাখ হতে অন্ততঃ কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত রংপুর ও দিনাজপুর জেলা পানির নীচেই থাকবে। রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় প্লাবন প্রসঙ্গে একটি বিষয় গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। বিষয়টি হলো সংযোগ খালের সংগম স্থল ও গমন পথের উচ্চতার তারতম্য। বাংলাদেশের যে স্থান দিয়ে সংযোগ খাল কাটা হবে সে স্থানের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ট হতে ৭০ থেকে ৮০ ফুটের মধ্যে। অথচ উক্ত খাল

www.pathagar.com

যে স্থান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করবে সমুদ্র পৃষ্ট হতে সে স্থানের উচ্চতা ১২০ হতে ১৩০ ফুট। মনে করা যেতে পারে সংগম স্থলের উচ্চতা আরো বেশী। অন্তত ১৪০ ফুটের নীচে নয়। (University of Dhaka Bangladesh in maps, Contours P—10)। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে রংপুর ও দিনাজপুরে অবস্থিত সংযোগ খাল ও সুবর্ণ সিড়ির জলধারের উচ্চতার পার্থক্য অন্ততঃ ৬০ ফুট। অর্থাৎ সংযোগ খালের সংগম স্থল বাংলাদেশের খাল হতে অন্ততঃ ৬০ ফুট উপরে অবস্থিত হবে। সুতরাং উক্ত স্থানে পানি পৌঁছাতে হলে বাংলাদেশের ক্ষেতের উপরেই ৬০ ফুট পানি সঞ্চিত রাখতে হবে। এতেই অনুমান করা যায় যে কি বিশাল এলাকা স্থায়ীভাবে পানির নীচে থাকবে। তাছাড়া প্রতি বছর বিপুল পরিমাণের পলি রংপুর দিনাজপুরের উপর পতিত হবে। ফলে উক্ত দুই জেলার সমস্ত জমি আবাদের অযোগ্য হয়ে যাবে। এছাড়া ৬৪ মাইল ব্যাপী খালকে পলিমুক্ত রাখার জন্য যে ড্রেজিং করা হবে, সে পলি কোথায় ফেলা হবে? তাছাড়া রংপুর ও দিনাজপুরের বাংলাদেশের সাথে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। খালের দক্ষিণ পাড়ের বগুড়া, পাবনা রাজশাহী জেলার সমস্ত খাল বিল ও নদী নালা শুকিয়ে যাবে। প্রবাহ হ্রাসের কারণে পুরানো ব্রহ্মপুত্র শুকিয়ে যাবে। মেঘনার প্রবাহ কম পক্ষে ৫০ হাজার কিউসেক কমে যাবে। কারণ পুরানো ব্রহ্মপুত্র মেঘনাকে শুষ্ক মওসুমে অন্ততঃ ৫০ হাজার কিউসেক পানির যোগান দিয়ে থাকে। যমুনার প্রবাহ হ্রাসের ফলে তাহার শাখা নদী লক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী শুকিয়ে যাবে। যার ফলে রাজধানী শহর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের সাথে প্রথম দিকে শুকনো মওসুমে এবং কয়েক বছর পর স্থায়ীভাবে সমগ্র দেশের নৌ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং ও নারায়নগঞ্জ শহরে খাবার পানি তীব্র সংকট দেখা দেবে। লক্ষ্যা ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গা ভরাট ও শুষ্ক হয়ে গেলে আমাদের যোগাযোগ এবং বাণিজ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবা তা ভাবতেও কষ্ট হয়।

পদ্মা, যমুনার প্রবাহ এক সাথে কমে গেলে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর কতটুকু নেমে যাবে তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। লবণাক্ততা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে ডঃ মোহাম্মদ

www.pathagar.com

শাহজাহান বলেন,

"Due to the withdwal of 100,000 cusec from the Brahmaputra river, the fair weather flow in the Jamuna river will become about 36% As a result the salinity front in the lower Meghna will move towards the inter ior of the country and the salinity levell will increase.

(একই সূত্র — ১০)

এখানে ডঃ শাহ্‌জাহান শুধুমাত্র যমুনার এক লাখ কিউসেক পানির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য ছোট নদী সমূহ হতে আরো এক লাখ কিউসেক পানি যে প্রত্যাহৃত হবে সে কথা উল্লেখ করেননি। এসব নদীর প্রবাহ মেঘনা দিয়েই সাগরে পড়ে।

যমুনায় বাঁধের ফলে বাংলাদেশের উপকূলে ভূমি গঠনের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। উপগ্রহের তোলা ছবিতে দেখা গেছে নিকট ও সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের উপকূলে ৪০ হাজার বর্গমাইল চর জাগবে ও বাংলাদেশের বন বিভাগ এক লাখ একর নতুন জমিতে বন সৃষ্টি করেছে। কৃষকরা বহু নতুন জমিতে আবাদ শুরু করেছে। যমুনায় বাঁধ দিলে পলির পতনের পরিমাণ কমে যাবে, যার ফলে নতুন ভূমি গঠনের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

একটা বিষয় আমাদের ভাবতে হবে। শুকনো মওসুমে ফারাক্কা দিয়ে ৬৫ হাজার কিউসেক পানি পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে প্রাবাহিত হয়। এ সময়ে যদি ২ লাখ কিউসেক পানির একটি প্রবাহ পূর্ব হতে পশ্চিম মুখী হয়ে গঙ্গায় পড়ে তবে গঙ্গার প্রবাহ তখন কোন্‌মুখী হবে? সংযোগ খাল কাটার জন্য যে সময় লাগবে সে সময়ে ফারাক্কা ও খালের সংগম স্থলের মধ্যবর্তী স্থানের ৩০/৪০ মাইল ভরাট হয়ে একটি বিরাট বাঁধ হয়ে যাবে। তাছাড়া গঙ্গার উজানে অত্যধিক প্রত্যাহারের ফলে গঙ্গা প্রায় শুকিয়ে যাবে। ফলে পানির গতি পরিবর্তিত হয়ে পশ্চিম-মুখী হবে ফারাক্কা শুষ্কই থেকে যাবে। তখন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা তোলা হবে। প্রশ্ন হলো ফারাক্কা কি একটি নদী? আমাদের শুধু-মাত্র গঙ্গার প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। গঙ্গা যে স্থান

www.pathagar.com

দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে সে স্থানের পানির প্রবাহ পরিমাপ করতে হবে। সে স্থানে পানি থাকলেই হলো। আমাদের সে পানির অংশ দাবী করতে হবে। ভারত তার পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার ইত্যাদি রাজ্যে ব্যবহারের জন্য নেপালে জলাধার নির্মাণ করতে পারে। নেপাল এ প্রস্তাবে অতিশয় আগ্রহী। মোট কথা ভারত বড় রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশকে নিয়ে অত্র উপ-মহাদেশের পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করে সকলের মাঝে আস্থা সৃষ্টি করে, এতদাঞ্চলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ভারতীয় শাসককুলের উগ্রপন্থী অংশ, একটি আধিপাত্যবাদী পরাশক্তির ইংগিতে সকল প্রতিবেশীকে শুধু চোখ রাঙিয়েই যাচ্ছে। তাই মনে হয়, অর্থনৈতিক কারণে নয়, সামরিক কারণেই ভারত সংযোগ খাল খননের ব্যাপারে জেদাজেদি করছে। আর ফারাক্কার বাঁধ প্রতিরক্ষা বাজেটের অর্থ দিয়েই তৈরী করা হয়েছে। উক্ত পরাশক্তিটির ইংগিতে মহাচীনের দ্বারপ্রান্তে সহজে পৌঁছার জন্য ভারত খাল কাটার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে মনে হয়। বাকী কথাবার্তা ধাপ্পাবাজী। ফারাক্কার ধাপ্পাবাজী ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণ অনুধাবন করতে পেরেছে।

গঙ্গার পানি প্রবাহ সমস্যা সমাধানকল্পে ভারত বাংলাদেশের যৌক্তিক প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে সংযোগ খাল কাটার জন্য বদ্ধপরিকর। **কোন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী এহেন প্রস্তাবকে আলোচনার বিষয়রূপে বিবেচনা করতে পারে না।**

ভারত তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য লোভ, উৎকোচ, চোখ-রাঙানী ও ক্ষমতাচ্যুতির হুমকিকেই মূলধন করেছে। ভারতের উগ্রপন্থী-দের কার্যকলাপ নেকড়ে এবং মেষ শাবকের গল্প স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিঃ দ্রঃ ৬৪ পৃষ্ঠায় তৃতীয় প্যারার তৃতীয় লাইন এইভাবে পড়তে হবে ঃ

ভবিষ্যতে আমাদের উপকূলে ৫০ হাজার বর্গমাইল চর জাগবে ও বাংলাদেশের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হবে। ইতিমধ্যে বহু চর জেগেছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ ইতিমধ্যে দশ লাখ একর নতুন বন সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলাদেশের কোটি কোটি জনতা নিজেদের মেষশাবক ও ভারতকে নেকড়ে বিবেচনা করে না। কথাটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করলে সকলের জন্যই কল্যাণকর হবে।

ভূ-গর্ভস্থ ও লোনা পানি

বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি একটি মূল্যবান সম্পদ। পাকিস্তান ও ভারত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করতে পারে না। কারণ পাঞ্জাব. রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানি লবণাক্ত। এসব পানি সেচ কাজে ব্যবহার করলে ফসলত মরেই যায় জমিও লবণাক্ত হয়ে যায়। ভারত ও পাকিস্তানের বিশাল এলাকার ভূ-মধ্যস্থ লবণাক্ততা বা Sub soil Salinity একটি মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশের উপকূল এলাকার সামান্য অঞ্চল ছাড়া আর কোথায়ও ভূ-গর্ভস্থ লবণাক্ততার সমস্যা নেই। এ দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি একটি অতীব মূল্যবান উৎকৃষ্ট সম্পদ। পানি বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিকে মোট দশটি এলাকায় ভাগ করেছেন। একমাত্র রাজশাহী জেলা ছাড়া বাংলাদেশের সমগ্র সমভূমির গর্ভে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। ডঃ মুহাম্মদ শাহজাহান গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নির্ণয় করেছেন। সময়ের তারতম্য অনুযায়ী ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিম্নরূপ ঃ—

মাস	পানির মজুদ (মিলিয়ন একর ফিট)	উত্তোলন যোগ্য (মিলিয়ন একর ফিট)	রবি শস্যে ব্যবহারযোগ্য (মিঃ এঃ ফিট)
নভেম্বর	১২·১৫	১·৮১	—
ডিসেম্বর	১·৩৬	১·৮৭	১·৮৭
জানুয়ারী	৮·৫২	১·৮৭	১·৮৭
ফেব্রুয়ারী	৬·৬৮	১·৬৯	১·৭৮
মার্চ	৫·২	১·৮১	১·৭৮
এপ্রিল	৩·১৮	১·৮১	১·৮৫

www.pathagar.com

(ডঃ এম, শাহজাহান, ষ্টাডিজ অন ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া পৃঃ ৩)।

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, শুষ্ক মওসুমে রবিশস্য আবাদের জন্য ৯৮ লক্ষ ১০ হাজার একর ফিট পানি তোলা ও ব্যবহার করা যায়। অবশ্য নদীর বর্তমান প্রবাহের স্থিরতার উপর পানি প্রাপ্তি নির্ভরশীল। এ যাবত মাত্র ৭ লক্ষ ১১ হাজার একর ফিট পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা আরো ৯১ লক্ষ একর ফিট পানি উত্তোলন ও ব্যবহার করতে পারি।

সামুদ্রিক লোনা পানিও বাংলাদেশের একটি মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশের ৮৯০০০ বর্গ মাইল সামুদ্রিক এলাকা রয়েছে। মাছ ও সামুদ্রিক আগাছা ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে লবণ সমুদ্রের পানিতে উৎপাদিত হয়। চট্টগ্রাম জেলায় অনেকগুলো লবণ তৈরীর আধুনিক কারখানা আছে। পটুয়াখালী, বরিশাল ও নোয়াখালীর উপকূলে হাজার হাজার অধিবাসী লোনা মাটি হতে লবণ তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আমি শৈশবে নদীর পাড়ের লোনা মাটি এনে আম্মাকে দিতাম। আম্মা উক্ত মাটি হতে অতি উৎকৃষ্ট লবণ তৈরী করতেন।

মৎস্য সম্পদ

এবার আমাদের অন্যতম প্রধান সম্পদ মাছ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। মাছকে আমাদের দেশে রূপালী সোনা বলা হয়। কারণ আমাদের মৎস্য সম্পদ এত প্রচুর ও মূল্যবান যে, একে সোনার সাথে তুলনা করা যায়। আমাদের দেশে দুই প্রকারের মাছ আছে। স্থলভাগের মিষ্টি পানির মাছ ও সামুদ্রিক লোনা পানির মাছ। উভয় প্রকারের মৎস্য সম্পদে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী দেশ।

মিষ্টি পানির মাছ চার প্রকার হয়, যথাঃ— (১) নদী, হাওড় ও বিলের মুক্ত মাছ, (২) পুকুর ও দীঘির আবদ্ধ মাছ, (৩) নীচু আবাদী জমির মাছ ও (৪) কাপ্তাই হ্রদের মাছ।

www.pathagar.com

আমরা বাংলাদেশের নদ-নদীর, বিল, হাওড় ও পুকুর সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরে বেশ বড় কতগুলো বাওড় আছে। এদের মধ্যে যশোরের বালুহার বাওড় (৬৭২ একর), জয়দিয়া বাওড় (৫১১ একর), মরজাদ বাওড় (৭২১-একর), প্রমুখ বিখ্যাত। হাওড়কে আমাদের দেশে বিল বলা হয়। সিলেট, মোমেনশাহী, ফরিদপুর জেলায় বেশ কয়েকটি বড় বড় বিল আছে। ঢাকা জেলার আড়ল বিল ও পাবনার চলন বিলের কথা আমরা জানি। তাছাড়া সিলেট জেলার হাকালুকি হাওড় (৮৯১৯১'৩৯ একর), টাঙুয়া হাওড় (৬২৯৯৯'৮২ একর) এবং মোমেনশাহী জেলার মেশথা বিল (১৬০০০ একর) ও খেরলাচর বিল (১৫০০০ একর) বিখ্যাত।

মানুষের তৈরী দীঘি ও পুকুরগুলোর মধ্যে দিনাজপুর জেলার রাম সাগর (৭০ একর), সুক সাগর (২২'২৩ একর), বামন দীঘি (৩৯'৫২-একর), মহারাজার দীঘি (৩২ একর), রংপুর জেলার দরিয়ার বিল (৯১'৩০ একর), নান্দিনা দীঘি (৩২ একর), রাজশাহী জেলার আলতা দিঘী (৪২ একর), কুসুম্বা দীঘি (২৫ একর), বগুড়া জেলার নান্দাইল দীঘি (৪২ একর), কুজিল দীঘি (৪৪ একর), পাবনা জেলার প্রতাব দীঘি (২৭ একর) জয় সাগর (৫৫ একর), কুমিল্লা জেলার জগন্নাথ দীঘি, রাণীর দীঘি, নোয়াখালী জেলার দালাল দীঘি (৩০ একর), বারাইয়া দীঘি, দম দম দীঘি এবং খুলনা জেলার খান জাহান আলী দীঘি প্রভৃতি বিখ্যাত।

বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি একর আবাদের জমি বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছের বিচরণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

কাপ্তাই হ্রদ পৃথিবীতে মানুষের তৈরী বৃহত্তম হ্রদ। এর আয়তন প্রায় ৯০২ বর্গ কিলোমিটার বা ৬০০ বর্গ মাইল।

বাংলাদেশে মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত গুলো অন্যতম ঃ—

(১) হালদা নদী—চট্টগ্রাম জেলায় গহিরা হতে কর্ণফুলী নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত।

(২) আড়িয়াল খাঁ—মাদারীপুরের নিকটবর্তী স্থানে।

www.pathagar.com

(৩) গড়াই নদী—কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী স্থানে।

(৪) গঙ্গা নদী—রাজশাহী শহর হতে পূর্বদিকে লালপুর পর্যন্ত।

(৫) যমুনা নদী—সিরাজগঞ্জ ও ফুলছড়ি ঘাটের নিকটবর্তী স্থানে।

(৬) পুরোনো ব্রহ্মপুত্র—মোমেনশাহী জেলার উত্তরাংশে।

বাংলাদেশের মিষ্টি পানিতে দু'শতেরও অধিক প্রজাপতির মাছ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালো বোয়াস, বোয়াল, শৈল, আইড়, রিঠা, চিতল ইত্যাদি বিখ্যাত।

বাংলাদেশে ৩৯ লক্ষ ৭ হাজার ৭২০ একর জমিতে সারা বছর চাষযোগ্য পানি থাকে। এর মধ্যে নদী ও শাখা নদীর আয়তন হল ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৭২০ একর, খাড়ির আয়তন হল ৪ লক্ষ ৫২ হাজার একর, প্রাকৃতিক বিল, বাওড়-হাওড়ের আয়তন ৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৯৯ একর, পুকুর র দীঘির আয়তন ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৯৯ একর এবং কাপ্তাই হ্রদের আয়তন ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৯৯ একর। তাছাড়া বৎসরে ৪ হতে ৬ মাস পানির নীচে থাকে এবং মাছের উৎপাদন ও বিচরণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, এমন আবাদী জমির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৭০ লক্ষ একর (Mahmudul Karim : status and potential of Bangladesh fisheries. p—12)।

১৯৭৯-৮০ সালে বাংলাদেশের মিষ্টি পানিতে নিম্নে উল্লেখিত পরিমাণ মাছ উৎপাদিত হয়েছে :—

পুকুর—	১,৯৯৭ টন
বিল বাওড় ও হাওড় —	৬৯,৩০২ টন
কাপ্তাই হ্রদ —	২,০০০ টন
সেচ কার্যে ব্যবহৃত খাল—	১,০০০ টন
খাড়ী—	১ ৯৯,৯৭০ টন
ধান ক্ষেত—	২,৩৭,৭৭৫ টন
নদ-নদী —	১,৯৯,৯৭০ টন
সর্বমোট	৫,২৪,৬৮৬ টন

সামুদ্রিক লোনা পানিতে ১৯৭৯-৮০ সনে ১,২২,০০০ টন মাছ উৎপাদিত হয় (Dr. Sanaullah Strategy for Aquaculture

www.pathagar.com

Development in Bangladesh. Planniing Commisson, P—6 & 7)

১৯৭৬-৭৭ সালে বাংলাদেশ মাছ রপ্তানি করে ২৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা (Mahmudul Karim. p—29) এবং ১৯৭৯-৮০ সালে ৬৯ কোটি টাকা (Dr. Sanaullah, p—2) আয় করেছে।

উপরোক্ত সংখ্যা তত্ত্ব হতে প্রমাণিত হয় যে, সামান্য উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মাত্র তৃতীয় বর্ষের মাথায় মাছের খাতে আয় বেড়েছে ৩২ কোটি ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে দু'টি বিষয় আলোচনা করতে হয়। তাহলো প্রতি ঘরে ক্ষুদে মৎস্য খামার স্থাপনের মাধ্যমে মিষ্টি পানির মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির অফুরন্ত সুযোগ ও বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে।

আমাদের মিষ্টি পানির মাছ আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি মূল্যবান সম্পদ। আমরা কখনো মাছের বংশবৃদ্ধি ও যথাযথ প্রতিপালনের জন্য কিছু করিনি। ডিম ওয়ালা মাছ আমাদের প্রিয় খাদ্য। আমরা কখনো চিন্তা করে দেখিনি যে, একটা ডিমওয়ালা মাছ খাওয়ার সাথে সাথে হাজার হাজার মাছের জীবন হানি ঘটে থাকে। পশুর বংশ বৃদ্ধি লক্ষ্যে গর্ভবতী গাভী বা ছাগী জবেহ করা হারাম করা হয়েছে। অথচ মাছের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিমওয়ালা মাছ হত্যা নিবারণের কোন কথা আমরা চিন্তা করি না। বরং মাছের প্রজনন-কালে ডিমওয়ালা মাছ হত্যার মহোৎসব লেগে যায়। এর ফলে মাছের বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে বাধা পড়ে। যে হারে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক কম ঘটে থাকে। মাছের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসে সারা দেশে সর্ব প্রকারের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। হাটে-বাজারে মিষ্টি পানির মাছ বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। যাতে কোটি কোটি মাছ ডিম প্রসব করতে পারে। মাছের হিমাগার গড়ে তুলতে হবে। উক্ত দুই মাসে হিমাগারে সংরক্ষিত মাছ, সমুদ্রের মাছ ও শুট-কীর সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে। বৈশাখ ও চৈত্র মাসে ঠিকমত

www.pathagar.com

ডিম প্রসব করতে পারলে কার্ত্তিক-অগ্রায়ণ মাসে প্রচুর মাছ পাওয়া যাবে। এসব মাছ বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণ করলে নিষিদ্ধ সময়ে মাছের অভাব ঘটবে না। বছরের কিছু সময় তাজা মাছ বিক্রি নিষিদ্ধ থাকলে আলু সংরক্ষণকারী ব্যবসায়ীদের ন্যায় মৎস্য সংরক্ষণ-কারী ব্যবসায়ী শ্রেণীও গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশে বিশেষ মওসুমে মাছের সরবরাহ এত বেশী হয় যে, মাছ সমস্যা রূপে দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ফরিদপুর জেলার নগর-কান্দা ও বোয়ালমারী থানার কতিপয় অঞ্চলের নীচু ভূমিতে এত মাছ মারা পড়তে দেখেছি যে, পচা মাছের কারণে মহামারী দেখা দিয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট শুনেছি, গোপালগঞ্জ ও অন্যান্য কয়েক জায়গায় সমস্যা এর চেয়েও বেশী প্রকট হয়। সিলেট ও মোমেনশাহী জেলার হাওড় অঞ্চলেও বছরের বিশেষ সময়ে এ ধরণের সমস্যা দেখা যায়। আমাদের নদীগুলির মোহনাতেও বিশেষ মওসুমে এত বেশী ইলিশ মাছ ধরা পড়ে যে বাজারজাতকরণ মারাত্মক সমস্যা হয়ে পড়ে। সেজন্য ধৃত অনেক ইলিশ মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক জনাব রেজায়ে করিমের মতে জৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবন মাসে বঙ্গোপসাগরের অধিবাসী ইলিশ মাছ বাংলা-দেশের নদ-নদীতে ডিম পাড়ার জন্য আসে। প্রকৃত পক্ষে আষাঢ়-শ্রাবন মাসে আমাদের দেশের সব নদীতে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনার উপকূলীয় নদীতে সারা-বছর ব্যাপী ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। তবে আশ্বিন কার্তিক ও অগ্রা-হায়ণ মাসে এসব নদীতে এত বেশী ইলিশ মাছ পাওয়া যায় যে, স্বাস্থ্য রক্ষার কারণে প্রচুর মাছ মাটিতে পুতে ফেলতে হয়।

মাছের ক্ষেত্রে আমরা এখনো আদিম যুগের "হয় ভূরি ভোজ নয় উপবাস" এর স্তরে আছি। যখন মাছের মওসুম আসে তখন প্রচুর খাই ও অপচয় করি। আবার মওসুম শেষ হয়ে গেলে মাছের জন্য হা পিত্যেস করে থাকি। মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু অর্থকরী ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে। দেশের বিভিন্ন মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রে মৎস্য হিমাগার স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য সংরক্ষণ করে সারাবছর মাছের সরবরাহের পরিমাণ ঠিক রাখতে পারলে

www.pathagar.com

মৎস্য প্রজননকালে সব ধরণের মাছ মারা নিষিদ্ধ করা যায়। অবশ্য এ সময়ে সমুদ্রে ও মোহনায় মৎস্য শিকারের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

আমাদের দেশে আরেকভাবে জীবিত মাছের সংরক্ষণ করা যায়। আমরা যেমন মুরগী পালন করে থাকি, তেমনি প্রতি গৃহে মাছ পালন করতে পারি। জনাব রেজায়ে করিম খাচায় মাছের চাষ করার সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ২৮ বর্গফুট একটি খাচায় বছরে ৮০০-১০০০ নাইলোটিকা মাছ পালন করা সম্ভব। তাছাড়া বৈঠক ঘরের একোরিয়ামেও খাবার মাছ উৎপাদন করা সম্ভব বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন (মাছের চাষাবাদ পৃঃ ১৭৫-১৮৩ প্রঃ)। আমরা আরো সহজে প্রতি পরিবারে মাছ পালন করতে পারি। বাসস্থানের নিকটে একটা গভীর গর্ত করে তাতে কৈ, মাগুর ও সিং মাছ অতি সহজেই পালন করা যায়। মাঝে মাঝে মাছের গর্তে পানি দিয়ে পানির পরিমাণ ঠিক রাখাত হবে। মেহমান অতিথি আসলে আমরা যেমন খাঁচা হতে মুরগী ধরে জবেহ্ করি, তেমনি প্রয়োজনে মাছের গর্ত হতে মাছ ধরে নিয়ে খেতে পারি। আবার সময় মত মাছের পোনা গর্তে ছেড়ে মাছের পরিমাণ ঠিক রাখা যায়। তাছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে আকাশে মেঘ ডাকার সময়ে গর্তে পানি ঢাললে কৈ মাছ ডিম পাড়বে ও একটা কৈ মাছ হতে ২০০০/৪০০০ পোনা পাওয়া যাবে (একই সূত্র পৃঃ ১২৯)। তাছাড়া মাগুর ও শিঙ্গির জন্য সামান্য ব্যবস্থা করলে এরা গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। মোট কথা আমরা যেমন যত্ন করে হাঁস মুরগী পালন করে থাকি, তেমনি করে মাছও পালন করতে পারি। এতে লাভও অনেক বেশী হবে। প্রতি পরিবারে মাছের সাধারণ রোগ ও চিকিৎসা এবং খাদ্য ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পুস্তিকা থাকতে হবে। আমাদের প্রতিটি নাগরিকের মাছ সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এবার আমরা লোনা পানির মাছ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে আমাদের একটা বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। মানব ইতিহাসের প্রথম হতে আজ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের গভীরে প্রকৃতপক্ষে লোনা পানির মাছ আমরা শিকার

www.pathagar.com

করিনি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মিষ্টি পানির মাছের সীমাহীন সম্ভাবনা। আমাদের জেলে নৌকা ও যান্ত্রিক নৌকাগুলো উপকূল হতে ২/৩ মাইলের বেশী দূরে যায় না। তারা মূলতঃ ইলিশ মাছই শিকার করে থাকে। ইলিশ মাছকে মিষ্টি পানির মাছ বলা যায়। ইদানীংকালে ট্রলার আসার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গোপ-সাগর ছিল সামুদ্রিক মাছের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে মৎস্য শিকারীদের তাড়া খেয়ে উপসাগরীয় মৎস্যকূল বঙ্গোপসাগরে আশ্রয় নিয়েছে। এ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। ফলে বঙ্গোপসাগর বিশ্ব মৎস্য সমাজের কাছে নিরাপদ স্বর্গরূপে পরিচিত হয়েছে।

শিকারীর উপদ্রবহীনতা ছাড়া আর একটি কারণে বঙ্গোপসাগর মৎস্যকুলের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থলরূপে পরিচিতি লাভ করেছে। সেটা হলো প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি পানির ধারা। অর্ধ চন্দ্রাকারের বঙ্গোসাগরে তিনদিক থেকে যেভাবে নদী বাহিত মিষ্টি পানির স্রোত ধারা পতিত হয়, পৃথিবীর আর কোন উপসাগরে তা হয় না। ফলে বাংলাদেশের উপসাগরে মাছের সুষম খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। উপাদেয় খাদ্যের লোভেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে মৎস্যকুল বঙ্গোপসাগরের দিকে হিজরত করে থাকে। এ দু'টি কারণে বিশ্বের মৎস্য বিশেষজ্ঞ-গণের নিকট বঙ্গোপসাগর রূপালী সোনার খনিরূপে পরিচিত হয়েছে। এ খনিতে কি পরিমাণ মাছ আছে তা কখনো নিরূপণ করা হয়নি। বাংলাদেশের অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদ নিয়েও গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তার একটা হলো দস্যুবৃত্তি আর অপরটি চৌর্য বৃত্তি।

থাই-বাংলাদেশ চুক্তির পূর্বে ও পরে থাই ও ভারতীয় ট্রলারগুলো রীতিমত দস্যুতা করছে। থাই-বাংলাদেশ মৎস্য চুক্তি বাংলাদেশের জন্য আরো ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। থাই ট্রলারগুলো মৎস্য শিকারের পরিবর্তে মৎস্য বিতাড়নে বেশী উৎসাহী ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য শিকারের প্রক্রিয়ায় বিশেষ সাবধানতা অব-

www.pathagar.com

বপন করা হয়। যাতে অকারণে মাছেরা ভয় না পায় এই লক্ষ্যে আধুনিক ট্রলারগুলো বৈদ্যুতিক শকের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। ট্রলারগুলো জাল পেতে পানিতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত করে মৎস্যদের তাড়িয়ে জালে ঢুকিয়ে থাকে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় থাই ট্রলারগুলো এ পদ্ধতি ব্যবহার না করে এমন এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, যা বঙ্গোপসাগরের মৎস্যকুলের হাজার বছরের শান্তিতে মারাত্মকভাবে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। থাই ট্রলারগুলো মাছদের তাড়া করে জালে ঢুকানোর জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিবর্তে Sound Bomb বা শব্দ বোমা ব্যবহার করেছে। পানির নীচে বোমার বিকট শব্দে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যকুল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দলে দলে আমাদের উপসাগর ছেড়ে ভারতের দক্ষিণ উপকূল দিয়ে পশ্চিম দিকে আরব সাগর ও রেঙ্গুন উপসাগর দিয়ে পূর্বদিকে থাই উপসাগরের দিকে হিজরত করেছে। এর ফলে হাজার হাজার বছর যাবৎ মৎস্যকুলের স্বর্গরূপে পরিচিত বঙ্গোপসাগর হতে কি পরিমাণ মাছ অন্য দেশে হিজরত করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যাহোক, থাই ট্রলার বিতাড়নের মাধ্যমে আবার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বাংলাদেশের ট্রলারগুলোতে মৎস্য বিতাড়নের জন্য আধুনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা থকে।

আমাদের উপসাগরে কি পরিমাণ মাছ আছে তার কোন সঠিক জরিপ আজ পর্যন্ত হয়নি।

ইউনিসেফের সাহায্যে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছের কিছু কিছু অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। একটি জরিপে বঙ্গোপসাগর হতে বছরে চিংড়ি ছাড়া অন্তত ১,৫৭০০০ টন অন্যান্য মাছ উৎপাদন করা যায় বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। (Terminal report on the survey for the Devolopment of fisheries of Bangladesh : SF/PAK-22 (FAO) 1712 দ্রঃ। বাংলাদেশের মৎস্য বিশেষজ্ঞগণের মতে আমাদের উপসাগরে বছরে ২৬৪,০০০-৩৭৩,০০০ টন মাছ পাওয়া যাবে (Mohmudul karim : status and potential of Bangladesh fisheries p-17)। তাছাড়া বৎসরে অন্ততঃ ৩০,০০০ টন চিংড়ি উৎপাদন করাও সম্ভব। উপরোক্ত হিসাব হতে বুঝা যায় যে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অনায়াসে প্রতিবছর ৪ লাখ টন সামুদ্রিক মাছ রপ্তানি করতে পারে।

মাছ আমাদের একটি মূল্যবান সম্পদ। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের বেলায়ও আমরা অতিশয় নিরাসক্ত। এর বংশ বৃদ্ধি লালন-পালন ও চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের কোন খেয়াল নেই। আমরা নির্বিচারে শুধু মাছ হত্যা করতে পারি। আমাদের দেশে প্রায় ৪১,৯০২ জন জেলে আছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামে ৩১,৮৫২ জন নোয়াখালীতে ৩০৭৫ জন ও খুলনায় ১,৬১৯ জন বাস করে (UNDP Project Publication no-2,1972)।

উপরোক্ত জেলেরা সমুদ্রে মৎস্য শিকারী। তাছাড়া আমাদের দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর জেলে রয়েছে। যারা নদীতে, বিলে, হাওড় বাওড়ে ও পুকুরে মৎস্য শিকার করে থাকে। আমাদের দেশের জেলেরা শুধু মাছ হত্যা করতেই জানেন। তাদের মৎস্য পালন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই আর তার প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করে না।

মাছের ব্যাপারে আমাদের এই নিস্পৃহ মনোভাব আর চলতে দেয়া যায় না। এদেশে প্রতিটি নাগরিককে খোদার দেয়া মূল্যবান দান মৎস্য সম্পদের যথাযথ প্রতিপালন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন মানের উন্নতি করতে হবে।

পানি সম্পদ ও আমাদের রাজনীতি

প্রাশ্চাত্যের কয়েকজন প্রখ্যাত সামাজিক চিন্তাবিদ প্রাচ্য দেশের সমাজের উপর পানির গভীর প্রভাবের কথা বলেছেন। এদের মধ্যে কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েভার, উইট ফোগেল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উইট ফোগেল তার "প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র" (K. A. wittfogel ; Oriental Despotism, New Haven 1957) নামক গ্রন্থে মতবাদ প্রকাশ করেছেন যে, প্রাচ্য দেশীয় সমাজ ও সভ্যতা বড় বড় নদীর তীরে জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছে। নদীর স্রোতই তাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। বড় বড় নদীর বন্যাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

নীল, সিন্ধু, হোয়াং হো প্রভৃতি নদীর তীরের মানুষদের প্রাণ ধারণ করতে হোত। এসব নদীর স্রোত ও বন্যাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের লোকদের দলবদ্ধ জীবন যাপন করতে হতো। এর ফলে এসব দেশে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে, যেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বা ব্যক্তি স্বাধীনতার স্থান হয়নি। উইট্ ফোগেলের মতে ভৌগলিক অবস্থার কারণে প্রাচ্য সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেনি। কার্ল মার্কস (The British Rule in India New York Daily Tribune, June 25-1855) ও ম্যাক্স ওয়েভার (General Economic History, Eng. 1950) উইট ফোগেলের সাথে পুরাপুরি একমত না হলেও প্রাচ্য দেশীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পানির অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশ প্রাচ্য সমাজেরই অংশ। এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে যে প্রাকৃতিক কারণে ইউরোপীয় সমাজে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও ব্যাক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটেছিল, আমাদের বিশ্বাস, মোটামুটি সেই একই কারণে বাংলাদেশেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধ ও গণ-তান্ত্রিক মূল্যবোধের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশে নদীর স্রোত নয়, বৃষ্টির মাধ্যমে প্রাপ্ত পানি দ্বারা কৃষি কাজ করে মোটামুটি এককভাবে বা ক্ষুদ্র দলের সাথে হয়ে জীবন যাপন করা যেত। তাই নীল, সিন্ধু বা হোয়াং হো নদীর তীরের অধীবাসীদের ন্যায় বাংগালীদের নদীকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেচের পানি সংগ্রহের লক্ষ্যে কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বে দলবদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়নি। এ কারণে প্রাচীন কাল হতেই এদেশের মানুষের মনে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গভীর ভাবে গ্রথিত হয়েছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতি দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর স্বাভাবিক আনুগত্য গড়ে উঠেছে, বাংলাদেশে তেমনটি কখনো হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশে বিশাল এলাকা-ব্যাপী প্রত্যক্ষ মালিক জোতদার বা জমিদার শ্রেণীও বিকশিত হয়নি। তার কারণ হোল বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এদেশের মানুষ একক ও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারতো। এ কারণেই বাংলাদেশে

www.pathagar.com

অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক আগেই ভূমিতে ব্যাক্তি মালিকানা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুঘল শাসকদের কর ব্যবস্থায় তার কিছুটা সরকারী স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তবে এদেশের রাজনৈতিক কাঠামোয় পানির গুরুত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

পানিই বাংলাশের জীবন। এ দেশের প্রতিটি নাগরিকেই পানি সম্পদ ও এতদসম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে নিম্নতম প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে হবে। সেই প্রাচীন কাল হতেই যথা সময়ে পরিমাণ মত বৃষ্টি হলে এদেশে এত বেশী ফসল উৎপন্ন হতো যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ মাছে-ভাতে আর গান-বাজনায় আনন্দে বছর কাটাতে পারতো। আবার অনাবৃষ্টির ফলে খরা বা অতি বৃষ্টির ফলে বন্যা হলে, অভাব অনটনে আর উপবাসে তাদের দিন কাটতো। যা হোক লোকসংখ্যা কম থাকায় আর বিদেশী শোষণের ধারা অত প্রখর না হওয়ার কারণে অভাব অত তীব্র হতো না। মুসলিম শাসকগণ অনুভব করলেন যে, শুধুমাত্র বৃষ্টির পানির দ্বারা ব্যক্তি-গত উদ্যোগে চাষাবাদ করলে বর্দ্ধিত জনতার খোর পোষও হবে না—রাজ ভাণ্ডারে প্রচুর রাজস্বও জমা পড়বে না। তাই তারা শুকনো মওসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা করণ ও বর্ষা মওসুমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মধ্যযুগীয় পন্থায় সেচ কায শুরু করেন। আমাদের দেশের মুঘল ও স্বাধীন নরপতিগণ কর্তৃক কাটা অসংখ্য দীঘি ও খাল এ প্রচেষ্টারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কার্লমার্ক্স বলেন, মুসলিম আমলে নিয়মিত নদীর পলি নিস্কাষণ, খাল ও পুকুর খননের ফলে শত যুদ্ধ বিগ্রহ, লুটপাট ও অরাজকতা সত্বেও গণ জীবনে দুর্ভিক্ষের অভিশাপ অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। ইংরাজ শাসক বাংলাদেশকে শোষণের পন্থাসমূহে প্রভুত উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা সেচকার্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে।

"Now the British in East India accepted from their Pr-- decessors the development of finance and of war, but they of have neglected entirely that of public works. (Marx : The British Rule in India, Selected works of marx and Engels. P—54)।

www.pathagar.com

উৎপাদনের ব্যবস্থা না করে শোষণের ফলে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। এ দুর্ভিক্ষ এমন আকার ধারণ করে যে, ১৯৪২/৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এ দেশের জন সংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ ক্ষুধার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এর পর হতে দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশে অতি পরিচিত ও স্থায়ী বিষয়ে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠার পরও কেহই এ দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির মৌলিক বিষয় অর্থাৎ সেচ ব্যবস্থার দিকে নজর দেয় নি। বরং নানা কায়দায় জনগণকে শোষণ অব্যাহত ছিল। ফল দাঁড়িয়েছে এই, এক কালের সুজলা সুফলা, শষ্য-শ্যামলা, খাদ্যে সীমাহীন উদ্বৃত্তের দেশ "বাঙ্গাল মুলুক" অসীম দারিদ্র্যের দেশে পরিগণিত হয়েছে। আজ আমাদের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে অন্তত ১৫ লক্ষ টন। আজ হতে দুই শত বৎসর পূর্বে আমাদের যে খাদ্য উৎপাদিত হতো এখনো তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম হয় না। কিন্তু দারিদ্রের পরিমাণ কতটুকু বেড়েছে? আর চিরকাল খাদ্য ঘাটতির দেশ রূপে পরিচিত ভারত ও পাকিস্তান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে রপ্তানী কারক দেশে পরিগণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, বাংলাদেশের জন সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও আমাদের মতই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও তারা খাদ্যের ঘাটতি মিটিয়ে রপ্তানী আরম্ভ করেছে। এ অবস্থার কারণ কি? কারণ হোল তারা আধুনিক সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে। আর আমরা স্বাধীনতার গত এক যুগে নানা রকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ ক্ষেত্রে স্থবিরই হইনি, রীতিমত পিছিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের জন সংখ্যা বৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা হ্রাসের কারণে শুধুমাত্র বৃষ্টির পানির উপর আর নির্ভর করতে পারি না। জাতীয় অস্তিত্বের জন্য আমাদের নদীর পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। আমাদের নদীর পানি প্রাপ্তির প্রধান বাধা হোল ফারাক্কা বাঁধ। পাকিস্তান আমলে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ শুরু করে। পাকিস্তান সরকার ভারতের সাথে ভাকরা বাঁধ জনিত সমস্যা যেভাবে সমাধান

www.pathagar.com

স্যা সমাধানের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ
াংগালীদের ভারতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত
ার রূপে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।
ভাদের জাতীয় জীবনে ফারাক্কার অভি-
রাক্কার সুদূর প্রসারী অভিশাপ বুঝতে
েছে।

১৯৭২ সালে তৎকালীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রি খোন্দকার মোশতাক আহমাদ জাতীয় সংসদে, "ফারাক্কা একটি জাতীয় সমস্যা বটে" বক্তব্যের মাধ্যমে সর্ব প্রথম আমাদের জাতীয় জীবনে ফারাক্কার সুদূর প্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতি ইংগিত করেছেন। খোন্দকার মোশ-তাক ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংকের পালিসী গ্রহণের জোর পক্ষপাতী ছিলেন। শেখ মুজিব খোন্দকার মোশতাককে বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় হতে অপসারণ করে, ফারাক্কার ক্ষেত্রে "আপোষ ও নতজানু" নীতির সূচনা করেন।

ফারাক্কাকে কেন্দ্র করে স্বাধীন বাংলাদেশের তিনটি সরকার তিন প্রকারের ভুল করেছে। যথা : শেখ মুজিব সরকার ১৯৭৪ সালে দ্বিপক্ষীয় ফারাক্কা চুক্তি করে ভারতীয় দাবীর প্রতি প্রথম সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ভারত বরাবর দাবী করে আসছে গঙ্গার পানি জনিত সমস্যা বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় বিষয়। অন্য কাউকে এ ব্যাপারে জড়িত করার প্রয়োজন নেই। ১৯৭৪ সালের পরীক্ষামূলক চুক্তি ছিল এ দাবীর প্রতি প্রাথমিক স্বীকৃতি। ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান সরকার ফারাক্কা সমস্যাকে জাতিসংঘে উত্থাপন করে, আবার দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে, আন্তর্জাতীক ফোরামে এ বিষয়টিকে পুনরায় উত্থাপনের পথে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। তবে জিয়া সরকারের আমলেই সর্ব প্রথম গঙ্গার পানি সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ায় নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সরকারী ভাবে দেওয়া হয় এবং অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খালের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। বর্তমান সরকার, সরকারীভাবে স্বীকার করেন যে, ফারাক্কায় বন্টন করার মত যথেষ্ঠ পানি নেই। সুতরাং ফারাক্কায় পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্পর্কে আমরা

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যাহোক, ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছি। টেকনিক্যাল ভূ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীল ভাবে নির্ভরশীল। যে সরকার এ সম্পদে নিশ্চিত করতে পারবে, সে সরকার হবে। পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও যথা খিত তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে জলাধার নির্মাণ করে, ১৯৫৬ সালের প্রবাহিত পরিমাণে পানি প্রাপ্তির জন্য করতে হবে।

(২) বাংলাদেশের যত ছোট নদী গুলিকে জলাধারে পরিণত করতে হবে। জেলার বুড়ি ভৈরব নদীর কথা উল্লেখ জেলার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে জালের মত এ নদী প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীতে ৩/৪ মাইল অন্তর পুল আছে। পুল নির্মাণের জন্য বিশাল নদীর দু'পাশ দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এসব বাঁধ ও পুলকে উন্নত করে স্লুইস গেট রূপে ব্যবহার করা যায়। নদীকে আরো গভীরভাবে খনন করে বর্ষার শেষের দিকে পানি সংরক্ষণ করলে যশোহরের বিশাল এলাকার কৃষি কাজের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটবে ও শুকনো মওসুমে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলের মিষ্টি পানির সমস্যা লাঘব হবে। যশো-হর জেলায় অনেক গুলি বড় বড় বিল বা বাওড় আছে। এ গুলি বর্ষা কালে ভরপুর থাকে ও আশ্বিনের মাঝামাঝি প্রায় শুকিয়ে যায়। এই গুলিকে আরো গভীরভাবে খনন করে জলাধার রূপে ব্যবহার করা যায়। বুড়ি ভৈরব ছাড়াও যশোহরে আরো কতগুলি নদী আছে। যেমন নব গঙ্গা, সীমা খালী নদী, খাজুরা নদী প্রভৃতি। এসব নদীকে জলাধাররূপে ব্যবহার করা যায়। উত্তর বঙ্গের সমস্ত জেলায় এরূপ অসংখ্য নদী, বিল ও খাল আছে যা জলাধার রূপে ব্যবহার করা যায়। আমার শৈশব ও কৈশরের অভিজ্ঞতা হতে আমি যেমন যশোহর জেলায়, তেমনি অন্যান্য স্থানে অবস্থিত নদ-নদীর নাম উল্লেখ করতে পারলাম না। তবে এটা সত্য যে বাংলাদেশে এমন গ্রাম কমই

www.pathagar.com

আছে যার দুই/তিন মাইলের মধ্যে নদী বা খাল নেই। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে এসব খাল ও নদী ডিসেম্বর মাসে পানিতে ভরপুর থাকে ও মানুষ ইচ্ছা না করলে পানি সরতে না পারে।

বাংলাদেশে যত পুকুর ও দীঘি আছে, তার সবগুলোকে আরো গভীর করে খনন করতে হবে ও তীরগুলোকে আরো উঁচু করে বাধতে হবে। এসব পুকুর ও দীঘিসমূহকে ক্ষুদ্র জলাধাররূপে ব্যবহার করা যায়।

(৩) উপরোক্ত পন্থায় বাংলাদেশে পানি সংরক্ষণের সকল সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। দেশের প্রতি বিন্দু পানিকে আপন দেহের রক্তের ন্যায় সংরক্ষণ করতে হবে ও তার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। দেশের সকল নদ-নদী খাল-বিলকে বিদ্যুৎ গ্রীড বা গ্যাসের গ্রীডের ন্যায় একটি সুসংহত গ্রীডের অধীনে আনতে হবে ও তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সেই প্রাচীন কাল হতেই পানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যে আমাদের জাতীয় জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা আমাদের দেশের নাম করণের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। বর্তমানে বাংলা ভাষাভাষী জনতার অধ্যুসিত অঞ্চল প্রাচীনকালে প্রায় সাত ভাগে বিভক্ত ছিল এবং এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। শশাঙ্কের রাজত্বের পর হতে এ অঞ্চল পুণ্ড্র, গৌড়, ও বঙ্গ নামে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ধীরে ধীরে এসব অঞ্চল এক নামে পরিচিত হয়। মুঘল শাসনকালে সবপ্রথম সুবা "বাংলাহ" নাম করণের মাধ্যমে আজকের বাংলাদেশ নামের উৎ-পত্তি ঘটে। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে "বাংলা" শব্দটি উৎপত্তির পটভুমিকায় 'আলে'র প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত 'আল' ব্যবহার কারী অঞ্চল সুবাহ বাংলা নামে পরিচিত হয়েছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ এনামুল হক, নীহাররঞ্জনসহ প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ এ মতবাদের সাথে এক মত। প্রকৃতপক্ষে আজকের বাংলাদেশে জীবন ধারণের জন্য আল ও বাঁধের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এ গুরুত্ব ইতিহাসের আদিকাল হতেই ছিল। আমাদের মনে হয়, বাঁধ ও আলের জন্যই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে, বাঁধ + আল —বাঙ্গাল। আজ-

www.pathagar.com

কের বাংলাদেশ। নামের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করলেই বাংলাদেশে পানির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

আজ বাংলাদেশে শুধু আলই আছে বাঁধ নেই। বাঁধ ও আলের সফল সমন্বয়ের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখানে একটা বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। অধুনা অনেক রাজনীতিবিদ ভূমি ব্যবস্থায় আলের অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলে থাকেন। অবস্থা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক কারণেই আলের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থানে অবস্থিত অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের জমির আল বিলুপ্ত করা যাবে না। স্মরণাতীত কাল হতে আজ পর্যন্ত পানি আমাদের জীবন, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুতরাং আজ আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই পানি সম্পদ ও তৎসম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিবহাল হতে হবে। আমাদের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পানি সংরক্ষণ ও তার যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে কর্মসূচী থাকতে হবে।

একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে, যত কঠিনই হোক বাংলাদেশের প্রতিটি নদী, খাল, নালা, ডোবা প্রভৃতিকে জলাধারে পরিণত করতে হবে। আর সে লক্ষ্য অর্জনই হোক আমাদের রাজনীতির মূল কর্মসূচী।

আমাদের পানি সম্পদ সংক্রান্ত নীতি যেন কখনো ভারতের নিকট নতজানুমূলক না হয়। কারণ, পানি সংকট সৃষ্টি করে ভারত আমাদের সার্বভৌমত্ব কুক্ষিগত করতে চায়। ভারতীয় রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণী (Political Elite) তাদের দেশের রাজনীতিতে পানির অপরিসীম প্রভাব অনুধাবন করেছে ও পূর্বাঞ্চল ব্যতীত বাকী সব অঞ্চলের প্রাণ শক্তি পানিকে শক্তভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে এনেছে। পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের পানি সম্পদকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করা তার প্রয়োজন। ভারত ইচ্ছা করলেই তার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পানি শক্তি দিয়ে বাংলাদেশকে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কারণ বৃষ্টির উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই, ব্রহ্মপুত্রের পানি পাহাড়ের উপর দিয়ে নেওয়া যায় না ও বর্ষার সুবিশাল

www.pathagar.com

ঢলকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই আমাদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে যাতে আমরা ভারতীয় কূট কৌশলের নিকট পরাজিত হয়ে, তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা কল্পে প্রস্তুত পানির বেড়াজালে জড়িয়ে না পড়ি। আল্লাহ্ আমাদের এমন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন যে, আমরা সামান্য উদ্যোগ নিলেই সারা বৎসর ব্যাপী প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা করতে পারি।

www.pathagar.com

জন সম্পদ

একটি দেশের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হোল তার মানব সম্পদ। মানব সম্পদে উন্নত দেশই পৃথিবী শাসন করে। আমাদের দেশে সাধারণত মানুষকে সম্পদ নয়—সমস্যা মনে করা হয়। জনসংখ্যাধিক্যকেই আমাদের সকল সমস্যার মূল কারণ বলে মনে করা হয়। প্রকৃত-পক্ষে জনসংখ্যা আমাদের সমস্যা নয়—একটা মূল্যবান সম্পদ। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় তা প্রমাণিত হবে।

১৯৮১ সালের গণনা অনুযায়ী আমাদের দেশে মোট লোকসংখ্যা হোল ৮,৭০,৫২,০০০। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪,৪৮০,৫০০০ ও স্ত্রী লোকের সংখ্যা ৪,২২,০২,০০০।

নিম্নের চিত্র হতে আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে ঃ

১৮৯১	১৯৪১	১৯৭৪	১৯৮১
২,৪৬,৬৮০০০	৩,৯৭,৮৫০০০	৭,১৪,৮১০০০	৮,৭০,৫২০০০

(B. B. S. Statistical year book. 1981, P—53).

১৯৭৫ সালের হিসাব মতে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ও অনুপাত নিম্নরূপ ঃ

	মুসলিম	হিন্দু	তপসিলী বর্ণ
সংখ্যা—	৬,১০,৩৯০০০	৪৯,২৬০০০	৪৭,৪৭০০০
হার	৮৫·৩৯%	৬·৮৯%	৬·৬৪%
	বৌদ্ধ	খৃস্টান	অন্যান্য
সংখ্যা	৪,৩৯০০০	২,১৬০০০	১,১১,০০০
হার	০·৬১%	০.৩১%	০·১৫%

(Statistical year book of Bangladesh, 1975, P—29).

www.pathagar.com

১৯৮১ সালের হিসাব মতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী উপজাতিসমূহের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪০৩৭২৮	জন
চট্টগ্রাম	১৭,৩৭০	,,
দিনাজপুর	১১৯০৯	,,
রংপুর	৬৩০১	,,
বগুড়া	১৩৫২৯	,,
রাজশাহী	৩০৮২৪	,,
পটুয়াখালী	৪৮৮৫	,,
সিলেট	১৮১৮৭	,,
ময়মনসিংহ	১,১৫,৯৯২	,,
মোট	৬,২৩,২২৫	জন

(Census Report 1981) Statistical year book 81, P—43)

১৯৭৪ সালের হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে মোট ২ কোটি ২৮ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। পেশা অনুযায়ী যাদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

কৃষি	১,৫৮,৩২০০০
খনি শ্রমিক ও কর্মচারী	২০০০
ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিক ও কর্মচারী	৯,৪৬০০০
বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি শ্রমিক ও কর্মচারী	৮০০০
নির্মাণ শ্রমিক ও কর্মচারী	৬৩০০০
আড়ৎদারী ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও কর্মচারী	৭৭১০০০
যোগাযোগ এবং স্টোরেজ শ্রমিক ও কর্মচারী	৩,২০,০০০
অর্থ বিভাগীয় কর্মচারী	৫৬০০০

উপরোক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে ৮ লক্ষ ৪০ হাজারি মহিলা ছিল।

১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৫১ টি পরিবার আছে। এর মধ্যে ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৩৫টি পরিবার শহরে ও বাকী ১ কোটি ১৬ লক্ষ ১০

www.pathagar.com

হাজার ২১৬টি গ্রামে বাস করে। পরিবারগুলোকে সদস্যসংখ্যা ও সম্পর্ক অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়ঃ

	এক ব্যক্তি	সন্তান ছাড়া	সন্তানসহ
গ্রামীণ ঃ	৩,২৭,০৬৬টি	৯৮৭৬১৩টি	৯৬,৭১,৩৩৩টি
শহরে ঃ	৫৮০৯৫টি	৮৪০৬৩টি	৮১৪৯৬৪টি
	পিতামাতাসহ	অন্যান্য আত্মীয়সহ	আত্মীয় ছাড়া
গ্রামীণ ঃ	৪৮০৮৫১টি	১১০৮০১টি	৩২৫৫২টি
শহরে ঃ	২৫৭০১টি	৪৮৬০৩টি	৩৪০০৫টি

এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যা, তাদের ধর্ম, পেশা ও পরিবার সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা বাংগালী জনগোষ্ঠীর রক্ত ও জাতপাতের ঠিকুজী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব ঃ

বাংগালী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নানা মত আছে। প্রকৃতপক্ষে কোন মতের অনুসারীই এ ব্যাপারে বিজ্ঞানভিত্তিক গভীর গবেষণা চালাননি। আমরা এতদ্‌সংক্রান্ত কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

জার্মান পণ্ডিত ইভারলিস্‌নার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, অতি প্রাচীনকালে দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান অঞ্চল ও অস্ট্রেলিয়া একটি ভূখণ্ড দ্বারা সংযুক্ত ছিল। সুতরাং এ অঞ্চলে একই জনগোষ্ঠী বসবাস করত। তিনি লিখেছেন ঃ

"Australia was not always an isolated Island continent—at one time it was connected with south east Asia. It is even possible that south Africa, India and Australia were all linked together by that now submerged portion of the earth, which Zoologist call Lemuria and geologist gondwana. However, since men existed long before continent, were severed, Australia to day is regarded as mankind's anthropological museum. It can not be mere coincidence that Man no-1 was found on the neighbouring Island of Java (The living past : Ivar lisner. Trans lated T. Maxwell Brown, John, 1957, P-226).

www.pathagar.com

উপরোক্ত ধারণার ভিত্তিতে অনেক নৃতাত্বিক মনে করেন যে, আজকের বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল proto-Austroloid বা আদি অস্ট্রালীয় নর গোষ্ঠী।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে একজন ইংরেজ পণ্ডিত বলেন,— "Bengal was never properly an Aryan country and the Aryans who did reside within its borders always held an uncertain footing among the aboriginal tribes."

James Wise ; Races,. castes, and trades of Eastern Bengal, London, Harison and sons, 1885, P-5)

উপরোক্ত বক্তব্যে এটা স্পষ্ট হয়, পশ্চিম হতে আগত আর্য রক্ত ও সংস্কৃতি এতদ্দেশীয় জনগণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও বাংগালী জনগোষ্ঠী উৎপত্তি সূত্রেই পৃথক।

জেমস্ ওয়াইজের পরবর্তী কালে স্যার হার্বার্ট রিজলে বাংগালী নর গোষ্ঠীর রক্তের ঠিকুজি নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি সমগ্র দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীকে মোট সাত ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ

১। তুর্কি ইরানী (Turko-Iranian), ২। ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan), ৩। সাইথী দ্রাবিড় (Scyth-Dravidian), ৪। আর্য দ্রাবিড় (Aryo-Dravidian), ৫। মঙ্গেল-দ্রাবিড় (Monglo-Dravidian ৬। মঙ্গোলীয় (Mongloid) এবং ৭। দ্রাবিড় (Dravidian)।

দেহের দৈর্ঘ ও গঠন প্রণালী, মাথার আকার ও গঠন প্রনালী, চুলের রং ও প্রকৃতি, চোখের রং প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে রিজলে উপ-মহাদেশীয় জনগোষ্ঠীকে উপরোক্ত সাত ভাগে ভাগ করেছেন।

(Sir Herbert Risley : The People of India, 1915—P.33- 34)

রিজলের মতে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলরক্তের প্রধান্য বেশী। তাঁর ভাষায়,

"The Monglo-Dravidian type of lower Bengal and Orissa, comprising the Bengal Brahmans and Kayaths and Muhammadan of Eastern Bengal.

(একই গ্রন্থ ঃ পৃ—৩৩)।

www.pathagar.com

তিনি আরো লিখেছেন, "In western Bengal the Dravidian element is prominent; in Dacca and Mymenshing the type has undergone a change which scientific method enables us to assign to the effect of intercourse with mongolion race".

(একই গ্রন্থ ঃ পৃ—৪২)।

রিজলের উপরোক্ত দু'টি বক্তব্য হতে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগোষ্ঠীর রক্তের ধারার মাঝে পার্থক্য ফুটে উঠে। তাঁর মতে পশ্চিম বঙ্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্রাবিড় রক্তের প্রভাব বেশী ও বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মঙ্গোল রক্তের ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছে।

লেঃ কঃ ওয়াডেল বাঙ্গালীর রক্তে মঙ্গোল রক্তসহ নানা সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন (Lt. Col. Waddel Tribes of the Brahmaputra valley)।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ এনামুল হক ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শব্দের উপস্থিতি বিশ্লেষণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাঙ্গালীর রক্তের সাথে পৃথিবীর বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে।

ডঃ এনামুল হক অভিমত প্রকাশ করেছেন, আজকের বাঙ্গালী জাতি আদি অস্ট্রেলীয়, আলপাইনীয়, মঙ্গোলীয়, সেমিটিক ও হাবসী নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রণের ফসল (ডঃ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২—৩)।

তিনি কুড়ি, গণ্ডা, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দকে দ্রাবিড় ভাষা, মোটা ঢেকি প্রভৃতি মুণ্ডা ভাষা ও পন সাঁওতাল ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(একই গ্রন্থ ঃ পৃঃ—২৫ দ্রঃ)

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় ভাষার উপস্থিতি দেখাতে গিয়ে বলেছেন, ইংরেজী ভাষা ছাড়াও বহু ইউরোপীয় ভাষার শব্দ বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন ঃ

পর্তুগীজ ঃ আনারস, আলকাৎরা, আলপিন, ইত্যাদি।

ওলন্দাজ ঃ হরতন, রুইতন, ইস্ক্রু ইত্যাদি।

www.pathagar.com

তুর্কি : আলখাল্লা, দারোগা, লাশ, বিবি, খাতুন, বেগম ইত্যাদি।
(ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত পৃঃ ৬৩—৬৭ দ্রঃ)

উপরোক্ত দুই জন ভাষাবিদের মতবাদ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নানা জাতির রক্ত বাঙ্গালীর রক্তে সংমিশ্রিত হয়েছে।

জনাব আবদুস সাত্তার বাংলাদেশের উপজাতিসমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় এটা স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে যে, বাংগালীর রক্তে মঙ্গোল, বামিজ, দ্রাবিড় প্রভৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে।

(আবদুস সাত্তার : আরণ্য জনপদে দ্রঃ)

নীহার রঞ্জন রায় রিজলীর মতবাদ অস্বীকার করে বলেন যে, বাঙ্গালীর রক্তে নিগ্রোবটু, অস্ট্রেলয়েড, ভেডডিড্, মঙ্গোল ও শক রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। তাঁর মতে বাংগালীর রক্তে অস্ট্রেলয়েডের প্রভাবই বেশী! তিনি বলেছেন, বাংগালী একটি শংকর জাতি। তাঁর ভাষায়, "বিভিন্ন পণ্ডিতের সম্মিলিত গবেষণার ফল মোটামুটি বাঙ্গালীর জনসাংকর্য্যের ইংগিত সমর্থন করে" (নীহার রঞ্জন : বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ১৫)।

তিনি আরো লিখেছেন, "সংকর জন হলেও বিচিত্র আদান-প্রদান ও মিশ্রণের ফলে বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৈশিষ্ট্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই মধ্যমাকৃতি, মাথার গড়ন দীর্ঘও নয়, গোলও নয় ; নাসিকা দীর্ঘও নয়, প্রশস্তও নয় ; দেহাকৃতি দীর্ঘও নয়, খর্বও নয়। এই মধ্যমাকৃতি দেহ লক্ষণই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য।" (একই গ্রন্থ : পৃ—১৯)।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাঙ্গালী জাতি কোন বিশেষ একটি নর গোষ্ঠী হতে উৎপত্তি লাভ করেনি। পৃথিবীর সব প্রধান নর গোষ্ঠীর রক্ত বাঙ্গালীর দেহে রয়েছে। এ সংমিশ্রণের কারণে বাঙ্গালীরা জাতিগতভাবে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানিগণ অনেক গবেষণা করে অভিমত প্রকাশ

www.pathagar.com

করেছেন যে, বিভিন্ন ধারার রক্তের সংমিশ্রণ যত বেশী হবে, উক্ত সংমিশ্রিত রক্ত হতে উৎপাদিত সন্তান ততবেশী মেধাবী হবে। প্রকৃত-পক্ষে বাংগালী শিশুগণ জন্ম লগ্নে বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা নিয়েই জন্মায়। সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়। প্রতিভাদীপ্ত চক্ষু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ কালে উক্ত দেশসমূহের শিশুদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। ঐসব দেশের শিশুদের সাধারণভাবে বাঙ্গালী শিশুদের মত বুদ্ধিদীপ্ত দেখা যায় না। যারা ভবিষ্যতে বিদেশে যাবেন, তাদের বিষয়টি পরখ করার জন্য অনু-রোধ করব। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ইউনিসেফের একজন কর্মকর্তার সাথে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি জাতিতে ছিলেন জার্মান। ভদ্রলোকের স্ত্রী এক কালে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ছিলেন, জাতিতে আমেরিকান। ১৯৭৪ সালের সে হতাশা ও আশা ভঙ্গের যুগে তাঁরা উভয়ে প্রায় বলতেন, বাংলীরা অলস ও কর্মবিমুখ। আমি একদিন তাঁদের মানিকগঞ্জ নিয়ে গেলাম। পথে, মাঠে কর্মরত কৃষকদের নিকট তাঁদের নিয়ে গিয়ে বললাম, এদের জিজ্ঞাসা কর এরা কখন মাঠের কাজে এসেছে? আর কতক্ষণ মাঠে থাকবে? কৃষকরা বলল, তারা বেলা ওঠার আগে মাঠে এসেছে। সকাল সাড়ে দশটার দিকে পান্তা ভাত খেয়েছে এবং বেলা আড়াইটার দিকে মাঠেই দুপুরের ভাত খাবে আর সন্ধ্যার দিকে বাড়ী গিয়ে খাবে। কৃষকরা বলল, প্রায় সপ্তাহ দু'য়েক তারা এভাবে কাজ করবে। কারণ এখন ফসল বুননের মওসুম। জমিতে "জো" এসেছে।

আমি তাঁদের নিয়ে গেলাম রিক্সাওয়ালার কাছে। বললাম: জিজ্ঞাসা কর, এ রিক্সা শ্রমিক প্রতিদিন একটানা কতক্ষণ কাজ করে? একজন রিক্সা শ্রমিক একটানা অন্তত ৮ ঘন্টা পরিশ্রম করে। মনের মত "খেপ" পেলে এক মিনিটও বিশ্রাম করতে চায় না। বিদেশী দম্পতিকে নিয়ে গেলাম পথের পাশের গাড়ী মেরামতের কারখানায়, দক্ষিণ ঢাকার ছোট ছোট লেদ মেশিনে, প্রেসে, শ্যাম বাজারে, সোয়ারী ঘাটে, বুড়িগঙ্গার খেয়াঘাটে। দেখালাম সর্বত্র বাংগালী শ্রমিকগণ মনের মত কাজ পেলে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে। বললাম, তোমরা বহু দেশের শ্রমিক দেখেছো, আমার দেশের মত কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিক আর

www.pathagar.com

কোন্ কোন্ দেশে তোমাদের নজরে পড়েছে? তাঁরা উভয়ে সম্পূর্ণ একমত হলেন যে, এমন পুষ্টিহীন, নিরাপত্তাহীন ও বিশ্রামহীনভাবে যে জাতি শ্রম দান করতে পারে, সে জাতির জন সম্পদ কখনো সমস্যা হতে পারে না। এটা একটা মূল্যবান সম্পদ। আমার দেশের যেসব শ্রমিক সবুজ শ্যামল বাংলার বুক ছেড়ে আরবের মরুভূমিতে গেছে, সেখানেও তারা প্রমাণ করেছে যে, তারা অন্যান্য দেশের শ্রমিক হতে কোন অংশে কম নয়।

আমাদের বাজারে "জিন্জিরা মেড" দ্রব্য আছে। অর্থাৎ হেন দ্রব্য নেই যা নকল হয় না। এ নকল করার যোগ্যতাই আমাদের সাধারণ শ্রমিকদের বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য বহন করে। নকল করার কাজটি সাধারণত শ্রমিকরাই করে থাকে। মালিক খালি প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দিয়ে থাকে। একজন সাধারণ শ্রমিক কি অদ্ভুতভাবে "সেভ্‌ন ও ক্লক" ব্লেডসহ আরো সূক্ষ্ম জিনিষের অবিকল নকল করে থাকে তা রীতিমত চিন্তার বিষয়। এককালে জাপান সরকারীভাবে এরূপ নকল করত। আজ জাপানের নিজস্ব ডিজাইন অন্যরা নকল করছে। আমরা কখনো আমাদের এসব নকল বিশেষজ্ঞ মেধাবী শ্রমিকদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করিনি। গ্রেফতার না করে এদের প্রয়োজনীয় মূলধন ও দ্রব্যের যোগান দিয়ে, নকল করার পরিবর্তে নিজস্ব ট্রেডমার্কে দ্রব্য তৈরীতে উৎসাহ দিলে আমাদের অর্থনীতিকে অনেকখানি প্রাণ সঞ্চারিত হতো। সেদিনই আমরা পত্রিকায় পড়েছি লালবাগ থানায় বসে একজন তরুণ, সাধারণ লেদ্ মেশিনের সাহায্যে পিস্তল বানিয়েছে। মুক্তি যুদ্ধের সময়ে আমার অধীনস্থ কয়েকজন নিরক্ষর মুক্তিযোদ্ধা মধ্যযুগীয় ফর্মুলা অনুযায়ী কামান তৈরী করেছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বে আমরা জহুরুল হক হলের পিছনে মাঝে মাঝে ঐসব কামানের পরীক্ষামূলক ফায়ার করেছিলাম। পরবর্তীকালে এসব কামান খুবই কাজে লেগেছিল।

আমরা প্রায় অত্র পত্রিকায় দেখি বাঙ্গালী তরুণগণ নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে। শুধু পত্রিকায় দেখা পর্যন্তই। খনিজ সম্পদ সম্পর্কে যেমন একদিন পত্রিকায় খবর দেখে আমরা কর্তব্য সম্পাদন করি, তেমনি জন সম্পদ সম্পর্কেও কাজ সারি।

www.pathagar.com

জন শক্তিকে সম্পদে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রথম যা করণীয় তা হোল নিরক্ষতা দূরীকরণ। সৃষ্টির আদি হতে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোন সত্যিকার উদ্যোগ নেয়া হয় নি। শিক্ষার অন্যান্য স্তর সম্পর্কে আলোচনা করব না, তবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা হোল স্বাধীন বাংলাদেশের সব কয়টি সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছে আর উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত আমলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের আর্থিক সুবিধার বিষয়টি দেখেছে।

বাঙালিগণ সাধারণভাবে শান্তিপ্রিয়, চরিত্রবান ও স্বল্পে তুষ্ট। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলা কালে আমরা বাংগালী জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়েছি।

মোট কথা সর্বদিক বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের জনশক্তি আমাদের জন্য সমস্যা নয়, বরং একটি অমূল্য সম্পদ। আমরা আমাদের মেধাবী, কুশলী, সৎ ও অল্পে তুষ্ট জনগণকে সম্পদে পরিণত করার কোন প্রচেষ্টাই চালাই নি। ফলে আগাছার মত বেড়ে উঠা জনগণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

বাংগালীর রণ কৌশলের সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পদ থাকলেই উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ধনী হতে পারে না।

সম্পদের উপর তার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, তার যথাযথ সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে ধনী হওয়া যায়। বাংলাদেশের সম্পদের অভাব নেই। ধনী ও সমৃদ্ধ জাতিরূপে গড়ে উঠতে হলে দু'টি বিষয়ের বিশেষ উন্নতি প্রয়োজন। যথা: প্রতিরক্ষা কৌশল ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। সম্পদ রক্ষা ও তার উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিরক্ষা কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক যুগে স্থলে-জলে

www.pathagar.com

অন্তরীক্ষে সর্বত্রই যুদ্ধ হয়। পৃথিবীর সব জাতিই মোটামুটি একই প্রকারের মারণাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবুও সবার রণকৌশল এক নয়। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব রণ কৌশল আছে এবং তা গড়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট দেশের ভৌগোলিক অবস্থান আবহাওয়া ও দৈহিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

সমাজ বিজ্ঞানিগণ সমাজের বর্তমান অবস্থা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রতিটি বিষয়ের উৎপত্তি, বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের গতি-ধারা সঠিকভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। সমাজ বিজ্ঞানের যে শাখা, সমাজ বিজ্ঞানীকে সামাজিক বিষয়াবলীর অতীত তথ্যাবলী সরবরাহ করে থাকে, তার নাম নৃতত্ত্ব। আত্মরক্ষার কৌশল বা রণ নীতি মানুষের জীবন ধারণের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়। কোন জাতির বর্তমান রণ কৌশলের মৌলিক নীতিসমূহ অনুধাবন করতে হলে তার অতীতকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বাংগালিগণ চিরকালই একটি লড়াকু জাতি। তবে তার রণ কৌশল অত্র অঞ্চলের অন্যান্য জাতির চেয়ে স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর রণ কৌশলের মৌলিক বিষয় আলোচনা করতে হলে তার অতীতকে জানতে হবে।

নৃতাত্ত্বিকগণ আদিম মানব গোষ্ঠীর জীবন ধারণ পদ্ধতিকে অনু-ধাবন করার জন্য তাদের নাচ-গান, খেলাধুলা ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাঁদের অভিমত, নিছক আনন্দের জন্য আদিম মানু-ষেরা নাচ-গান ও খেলাধুলার আবিষ্কার করেনি। জীবন ধারণের প্রয়োজনে অনুশীলিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহড়া আজ নাচ-গান বা খেলা-ধুলায় পর্যবসিত হয়েছে। এগুলিকে সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের আদিমতম জীবন ধারা সম্পর্কে যথার্থ ধারণা পাওয়া যেতে পারে। রণ কৌশল সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। বহু কাল পূর্বে, মানব সভ্যতার আদিম যুগে, আজকের মত যখন অস্ত্রের উন্নতি ঘটেনি, তখন নিছক জীবন ধারণের জন্য রণ কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যখন অস্ত্র ছিল অত্যন্ত স্থূল ও অপ্রতুল, তখন মানুষ তার রণ কৌশল প্রণয়ন করেছিল শুধু মাত্র দৈহিক যোগ্যতা ও প্রাকৃতিক অব-স্থার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং কোন জাতির বর্তমান রণ কৌশলকে

www.pathagar.com

সঠিকভাবে বুঝতে হলে, সে জাতির আদিমতম রণ কৌশল বুঝতে হবে।

বাঙ্গালী জাতির আদিমতম রণ কৌশল কি রূপ ছিল? আমরা আগেই বলেছি, নৃতাত্ত্বিকগণ বর্তমান সমাজের চিত্তবিনোদনমূলক খেলাধূলার মধ্যে সমাজের আদিম অবস্থায় জীবন ধারণ প্রণালী অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। আমরাও আমাদের আদিমতম পূর্ব পুরুষদের রণ কৌশল অনুধাবনের জন্য বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি খেলাধূলার পর্যালোচনা করব। যথাঃ হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, কানামাছি, ডুবো-লুকোচুরি, নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা ইত্যাদি। এসব খেলার মধ্যে নৌকা বাইচ ও লাঠি খেলা অতি সম্প্রতি কালে যুদ্ধের মহড়া ও অনুশীলনী হতে খেলার পর্যায়ে নেমে এসেছে। তবে আমাদের দেশের বহু স্থানে লাঠি খেলা এখনও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও মহড়ারূপে বিবেচনা করা হয়। ফরিদপুরের বিলাঞ্চলে, নোয়াখালী ও বরিশালের চরাঞ্চলে এবং মোমেনশাহীর হাওড়াঞ্চলে এখনও পেশাধারী লাঠিয়াল বাহিনী আছে। সড়কী, বল্লম, কোঁচ ইত্যাদিকে অবশ্যই লাঠি যুদ্ধের অংশরূপে বিবেচনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক কালে রাইফেল সুটিংও খেলাধূলার পর্যায়ে নেমে আসছে। যা হোক, এসব সম্পর্কে আরো পরে আলোচনা করব।

হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, কানা মাছি, ডুবো লুকোচুরি ইত্যাদি বাংলাদেশের রণ কৌশলের প্রাচীনতম রূপ।

হা-ডু-ডু বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। অবশ্যই তা শুধু মৌখিক ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। যা হোক, বাংলাদেশের সর্বত্র যুব-কিশোরগণ অবসর সময়ে হা-ডু-ডু খেলে থাকে। হা-ডু-ডু খেলার নিয়ম মোটামুটি নিম্নরূপঃ

সমান সংখ্যক দুই দল খেলোয়াড় দুই ভাগে বিভক্ত একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে পরস্পরমুখী হয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানে একটি দাগ দিয়ে খেলার ছোট মাঠটিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক পক্ষের একজন খেলোয়াড় এক নিঃশ্বাসের দম নিয়ে অপর পক্ষের কোর্টে "ছু" দেয়। একই নিঃশ্বাসে সে অপর পক্ষের খেলোয়াড়দের

www.pathagar.com

যে কয়জনকে ছুঁয়ে নিজ কোর্টে ফিরে আসতে পারে তাদের সকলকে মৃত বলে বিবেচনা করা হয়। আবার অপর পক্ষের খেলোয়াড়গণ 'ছুঁ' দানকারী খেলোয়াড়কে নিঃশ্বাস শেষ করে পুনরায় দম না নেওয়া পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলে উক্ত খেলোয়াড়কে মৃতরূপে ধরে নেওয়া হয়। এভাবে দু-দল খেলোয়াড় পরস্পরকে মারতে থাকে। এক দলের সকল খেলোয়াড় "মৃত" না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে।

হা-ডু-ডু খেলা বোধ হয় আমাদের দেশে গেরিলা যুদ্ধের আদিমতম মহড়া। এ খেলার দু'টি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এক : আক্রমণকারী খেলোয়াড় সাধারণত তার দলের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় দম সংরক্ষণকারী, বিদ্যুৎবেগে হাত-পা চালনাকারী ও অত্যন্ত হুশিয়ার ব্যক্তি হয়। অর্থাৎ সে তার দলের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা। তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপর পক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস না করে সুনির্দিষ্ট অপারেশন সফল করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তার অপারেশনের মূল লক্ষ্য হোল, অপর পক্ষের সেরা যোদ্ধাদের নিহত করা। আবার অপর পক্ষে যখন টের পায় যে, তাদের এলাকায় শত্রুর গেরিলা প্রবেশ করেছে, তখন তারা যে যেখানে থাকুক সকলেই শক্তি-শালী ও কুশলী যোদ্ধার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয় এবং আত্মরক্ষামূলক আক্র-মণ চালায়। গেরিলা আক্রমণকালে তাদের আত্মরক্ষামূলক রণনীতির মূল লক্ষ্য থাকে যাতে শত্রুর গেরিলা তার লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে না পারে। গেরিলার লক্ষ্যবস্তু সাধারণভাবে শত্রুপক্ষের শক্তিশালী "ছুঁ" দানকারী খেলোয়াড়গণ হয়ে থাকে। আক্রান্ত দল তাদের সেরা "ছুঁ" দানকারী খেলোয়াড়দের মাঝখানে রেখে আত্মরক্ষামূলক ব্যূহ রচনা করে। এ ব্যূহের দুই প্রান্তে থাকে তাদের দুইজন শক্তিশালী খেলোয়াড় বা যোদ্ধা। এ খেলার মধ্যেই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ-দের আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক রণকৌশলের ছবি দেখতে পাই। আক্রমনে বাছা বাছা যোদ্ধা ও আত্মরক্ষায় সকল জনগণের সক্রীয় অংশ গ্রহণই এরূপ কৌশলের মূল নীতি।

এবার ধরা যাক গোল্লাছুটের কথা। গোল্লাছুট মোটামুটি নিম্ন রূপে খেলা হয়ে থাকে :

www.pathagar.com

সমান সংখ্যক দু দল খেলোয়াড় একটি খোলা মাঠে এ খেলা খেলে থাকে। একদল একজন খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে হাত ধরাধরি করে ঘুরতে থাকে। তাদের লক্ষ্য হোল শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো। এ খেলার প্রধান সাক্ষ্য হোল, এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে তাদের দলপতি নিরাপদে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছুতে পারে। যদি দল পতি "ছোঁয়া" বা মারা না পড়ে যথাস্থানে পৌঁছুতে পারে তবে তার পক্ষের সকল খেলোয়াড় মারা গেলেও তার পক্ষেরই জয় হয়। আর যদি দলপতি মারা পড়ে, তবে তার পক্ষের সকল খেলোয়াড় জীবিত অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুলেও তার দলের পরাজয় হয়েছে বলে মনে করা হয়। অপরপক্ষ নির্দিষ্ট দূরত্বে এ পক্ষকে ঘিরে রাখে। তাদের লক্ষ্য হোল এপক্ষের কোন খেলোয়াড় নির্দিষ্ট স্থান যাতে না পৌঁছাতে পারে। এ খেলায় আত্মরক্ষাকারী দলকে আক্রমণকারী দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের উপর নজর রাখতে হয়। আবার দলপতির উপর বিশেষ নজর রাখতে হয়। সহজ বিজয়ের জন্য আক্রমণকারী দলের সদস্যগণ নানাভাবে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করে নিজেরা মরে গিয়েও দলপতিকে নিরাপদে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছানোর অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এ খেলায় ব্যাপক আক্রমণ (mass attack), আত্মরক্ষা এবং সেনাবাহিনীর মূল অংশকে শত্রুর ব্যূহ অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের কৌশল পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে এ খেলায় আক্রান্তকারী দলের কোন নেতা থাকে না। আত্মরক্ষার যুদ্ধে প্রত্যেককে নিজ বুদ্ধি ও তার উপর নির্ভর করে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরাও মাঝে মাঝে গোল্লাছুট কৌশল অবলম্বন করে আশাব্যঞ্জক ফল লাভ করেছি। একবার ফরিদপুর—বরিশাল রাস্তায় ১৫ মাইল ব্যাপী এলাকার পাঁচটি পুলে গোল্লাছুট কৌশলে শত্রুপক্ষকে বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত করে অতি সহজেই প্রচুর অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধা বহনকারী নৌকাকে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্ব হতে পূর্ব পার্শ্বে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

কানামাছি ও লুকোচুরি খেলাকে আমাদের আদি পুরুষদের শত্রুর অনুপ্রবেশকারী এজেন্টদের চিহ্নিত করা ও শত্রুর মাঝে আত্মগোপন

www.pathagar.com

করে স্বীয় লক্ষ্য হাসিলের কৌশলরূপে বিবেচনা করা যায়।

ডুবোলুকোচুরি পানিতে খেলা হয়। এ খেলায় একজন চোর হয় এবং পানিতে ডুব দিয়ে আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। বাকীরা তাকে ছোঁয়ার জন্য ধাওয়া করে। যে প্রথম ছুঁতে পারে সবাই আবার তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। এ খেলায় নদী-নালা, খাল-বিল সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পানিতে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রণ কৌশলেরই চিত্র পাওয়া যায়। ডুবোলুকোচুরি আমাদের 'ফগকমাণ্ডো'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উপরে বর্ণিত খেলাসমূহ কমপক্ষে দশ হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদের যুদ্ধের মহড়া ও অনুশীলনী ছিল। বর্তমানে এসব নিছক চিত্তবিনোদনমূলক খেলা-ধূলা হলেও আমাদের বর্তমান রণকৌশল প্রণয়নে এসব মৌলিক কৌশলগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। উপরোক্ত খেলাগুলো বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের রণকৌশলে নির্বাচিত যোদ্ধার দ্বারা গঠিত সুশৃংখল সেনাবাহিনীর ইউনিট আক্রমণাত্মক ও সুদক্ষ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে সমগ্র জনতা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সবার অলক্ষ্যে উপরোক্ত মৌলিক রণকৌশলটি অনুসারিত হয়েছিল।

বাঙ্গালী জাতির লড়াকু স্বভাব ও ভয়াবহ হিংস্রতা অনুধাবন করতে হলে লাঠিয়ালদের লড়াই ও গ্রাম্য 'কাইজা' বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমরা অত্র দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে পাঠান ও নেপালীদের সবচেয়ে বেশী লড়াকু ও হিংস্র বলে মনে করি। বাংগালীদের শান্ত ও ভীরু প্রকৃতির মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা সঠিক নয়। সাধারণত বাংগালীগণ যেভাবে শত্রুকে সামনা সামনি রেখে মরণ-পণ যুদ্ধ করে তেমনি নেপালী বা পাঠানরা করে না। তারা পাহাড়ের বা জঙ্গলের আড়ালে থেকে নিজে বেঁচে থাকার পুরা সম্ভাবনা মনে রেখে শত্রুর মোকাবেলা করে। তাছাড়া তারা শত্রুকে বধ করতে পারলেই হোল। অথচ একজন বাঙ্গালীর পাহাড়ে বা জঙ্গলে লুকিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার কোন সুবিধা নেই। তাছাড়া সে যদি শত্রুর কাছে পরাজিত হয় তাহলে মৃত্যু আবধারিত। আবার শত্রুকে হত্যা করলে ফাঁসী বা কারাদণ্ড অবধারিত অর্থাৎ একজন 'কাইজা'কারী বাংগালীর

www.pathagar.com

জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। এমন মানসিক অবস্থায়ও হাজার হাজার বাংগালী অহরহ লাঠি, বল্লম, কোঁচ, সড়কী ইত্যাদি নিয়ে লড়াই করছে। আর তারা লড়াই করছে খোলা মাঠে মুখোমুখি। হাঁক দিয়ে একে অপরকে আহবান করছে মৃত্যু পণ লড়াইয়ে। আমাদের সেনাবাহিনী গঠনে জাতীয় সাহসিকতার সাধারণ মান অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙ্গালীদের রণকৌশল অত্যন্ত কার্যকর ছিল। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলিকে দিল্লীভিত্তিক আক্রমণকারিগণ যেভাবে পদানত করতে পেরেছিল, সেভাবে বাংলাদেশকে কখনো কব্জা করতে পারেনি। অন্য অঞ্চলের সকলে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে পদানত করার জন্য অনবরত চেষ্টা করে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সে প্রচেষ্টা কখনো সফল হয়নি। সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংগঠিতভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, বাংগালীরা যোদ্ধা জাতি নয়। তারা কলহপ্রিয় ও ভীরু জাতি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংগালীগণ কাজের মাধ্যমে এ প্রচারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ বাংগালী সৈন্যগণ দ্রোনাচার্য্যের সাহায্যার্থে যোগদান করেছিল। বঙ্গবাহিনী তাদের শৌর্য্য-বীর্য্য ও রণকৌশলে আর্য্য বাহিনীকে বিমোহিত করেছিল (মহা ভারত ঃ ভীস্মপর্ব দ্রঃ)।

আলেকজাণ্ডার মগধের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলে বাংলাদেশ হতে ৬০,০০০ হাজার অশ্বারোহী, ৪,০০০ যুদ্ধরথ ও ৬,০০০ যুদ্ধহস্তী মগধের সাহায্যে প্রেরিত হয়েছিল (Histary of Bengal R. C. Majumder P-43)।

বাংগালীগণ সর্বপ্রথম হাতীকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের কৌশল উদ্ভাবন করে। বাংলাদেশের হস্তিবাহিনীর পদভারে সারা ভারত থর হরি কাঁপতো। একারণেই সে যুগে সুদুর কাশ্মীর পার হয়ে তিব্বত পর্যন্ত বঙ্গ সাম্রাজ্যের সীমানা পেঁৗছেছিল।

সম্রাট বাবর দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করেন। শক্তিশালী কামানের সামনে টপাটপ দক্ষিণ এশীয় রাজ্যগুলোর পতন ঘটে। কিন্তু বাংগালী বাহিনীকে পদানত করা এত সহজ

www.pathagar.com

হয়নি। বাংগালী রণবিশারদগণ অতি সহজেই নতুন অস্ত্রশস্ত্রের কারিগরি জ্ঞান ও রণকৌশল আয়ত্ত করে ফেলল। মধ্যযুগের স্বাধীন নরপতি বারো ভূঁইয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে উন্নতমানের অস্ত্র কারখানা গড়ে উঠেছিল। এসব কারখানায় গুলিস্তানের সামনে স্থাপিত বিশাল কামান ও ঢাকার যাদুঘরে সংরক্ষিত এক হাতে বহনযোগ্য কামান তৈরী হতো। গুলিস্তানের সম্মুখে স্থাপিত বিশাল কামানের কারিগর ছিল সিলেট জেলার জনার্দন নামক জনৈক ব্যক্তি। আজকের রাইফেল ও পিস্তলের পূর্বপুরুষ আমাদের যাদুঘরে সংরক্ষিত এক হাতে বহনযোগ্য কামানের কারিগরও ছিলো বাংগালী। কারণ এগুলোর উপর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখাকৃতি আঁকা আছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এসব বাংলাদেশের অস্ত্র কারখানায় তৈরী হয়েছিল।

যুদ্ধ জাহাজ তৈরীতে বাংলাদেশে কারিগরগণ দারুণ উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। তারা 'ছিপ' নামক অতিশয় দ্রুতগামী ও ক্ষুদ্রাকারের যুদ্ধজাহাজ তৈরীতে যেমন, তেমনি কালু খাঁ নামক বিশাল কামান বহন ও গোলা বর্ষণে সক্ষম বড় আকারের যুদ্ধ জাহাজ তৈরীতেও পারদর্শী ছিল। আধুনিককালে সভ্য পৃথিবী যেমন যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের জন্য আমেরিকা ও রাশিয়াকে বেশী পছন্দ করে, তেমনি মধ্যযুগে সভ্য পৃথিবী বাংলাদেশের যুদ্ধ জাহাজ ও কামান ক্রয়ে অতি উৎসাহী ছিল। বাংলাদেশ থেকে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের জন্য পশ্চিম হতে মিশর রাজের রাজদূত ও পূর্ব হতে ইন্দোনেশীয় রাজদূতগণ বাংলাদেশে আগমন করতেন (A Forgotten Empire : Robert Sewell, দ্রঃ)।

মধ্যযুগে বাংগালী যোদ্ধাদের রণকৌশল আজ রীতিমত গবেষণার বিষয়। তারা বাংলার প্রধান সম্পদ পানিস্রোতকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতো। মোঘল সেনাপতি সাহবাজ খাঁন বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁনের সাথে এক যুদ্ধে ব্রহ্মপুত্রের শাখা পনা নদীর তীরে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। বাংগালী রণবিশারদগণ এক অদ্ভুত কৌশলে এক রাতের মধ্যে পানা নদীর স্রোত ধারা পরিবর্তন করে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত মোঘল সেনা ছাউনি ভাসিয়ে দেয়। পানির স্রোতের তোড়ে বিশাল মোঘলবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়ঃ "This (Canal) com-

www.pathagar.com

pelled them to take flight and many of these men were drowned. They were defeated on all sides except in the battery of Saiyad Hussain, thanader of Dacca, who was taken prisonor".
(Eliot's Hitsory of India Vol. VI. P-75-76
& also Akbarnama ;
Text vol. III, P-437) ;

স্বাধীন বাংলাদেশের তরুণ রণপ্রকৌশলীদের আজ গবেষণা করে জানাতে হবে কি উপায়ে তাদের পূর্বপুরুষগণ নদীর স্রোত-ধারাকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল। হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য বর্তমান ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের রণ-বিশারদদের আধুনিক রণকৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সমগ্র জাতিকে প্রশিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে যে লক্ষ লক্ষ বাংগালী অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তা অনুশীলনের মাধ্যমে অব্যাহত রাখতে হবে। হালকা অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও নেতৃত্বদানের জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সুনিপুণ সৈন্যদল গড়ে তুলতে হবে। আমাদের তিনদিকে আধিপত্যবাদী পরাশক্তির সমর্থনপুষ্ট আগ্রাসী শক্তির প্রধান লক্ষ্য হোল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রশি-ক্ষিত লক্ষ লক্ষ বাংগালী যুবকের চরিত্র হনন, তাদের মাঝে দলা-দলি সৃষ্টি ও সর্বশেষে আত্মঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে দেওয়া। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর হতে এ কাজটি অতি কৌশলে কিন্তু স্বচ্ছন্দে করা হচ্ছে। আমরা কেউই এর প্রতিবিধানে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করছি না। হালকা অস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞ বাংগালীদের ক্ষমতা মোহ, এই বাহিনী সেই বাহিনী, স্বাধীনতা পক্ষ-বিপক্ষ, দেশপ্রেমিক শক্তি-দেশদ্রোহী শক্তি, নানা প্রকারের তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি নানা পন্থায় বিভক্ত ও আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত করা হচ্ছে। এ অবস্থা আমাদের শেষ ভরসাস্থল প্রিয় সেনা-বাহিনীর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করানোর জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। এভাবে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যাতে জাতীয় প্রয়োজনে বাংগালী কখনো সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না

www.pathagar.com

পারে। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন থাকতে হবে, যাতে কতিপয় শক্তিশালী ব্যক্তির বা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আকাশচুম্বী লালসার কারণে বা অদূরদর্শিতার ফলে আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড না হয়ে যায়। আমাদের যত সম্পদই থাকুক না কেন, তা রক্ষা করার যোগ্যতা না থাকলে কোনদিনই আমরা আমাদের সম্পদকে ভোগে লাগাতে পারব না। এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ঃ

সমাজ বিজ্ঞানিগণ সামাজিক কাঠামোকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে থাকেন। কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, সামাজিক কাঠামো প্রত্যয়টি সমাজ বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় ধারণা, "Social structure is one of the central cencepts of Sociology. (H. Spencer : Principle of Sociology দ্রঃ)। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁর Discovery of India গ্রন্থে মূলত ভারতীয় সমাজের কাঠামো ও তার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং জেনারেল আইউব খানও পাকিস্তানী সামাজিক কাঠামোর উপর আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর উপর কোন রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা কোনরূপ আলোচনা করেন নি। অথচ রাজনৈতিক অঙ্গনে অবস্হানরত প্রতিটি নাগরিকেরই সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রত্যয়ের মত "সামাজিক কাঠামো" প্রত্যয়টি বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সংজ্ঞার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা কর. তবে বিষয়টির একাডেমিক দিকটি অনুধাবনের জন্য কয়েকজন পণ্ডিতের অভিমত তুলে ধরবো।

র‍্যাড্‌ক্লিফ ব্রাউনের মতে, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সকল সামাজিক সম্পর্কই সামাজিক কাঠামোর একটি অংশ, "A part of the Social

www.pathagar.com

structure is all Social relations of person to person." (—A. R. Redcliffie Brown : on Social structure P-191-2)।

রেমন ফার্থের মতে, সমাজ ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (R. Firth : Elements of Social Organization, P—30)।

প্রখ্যাত ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী মরিস্ জিন্স্ বার্গ সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর ভাষায়, "The social structure of a community includs the different types of groups which the people form and the institutions in which they take part" (M. Ginsberg ; The Study of Society, P—98)।

জিন্স্ বাগের অভিমতকে সমর্থন করে T. B. Bottomore বলেন, "The most useful seems to me that which regards social structure as the complex of the major institutions and groups in society (T. B. Bottomore : Sociology, P—III)।

আমরা উররোক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলেই অনুধাবন করতে পারি যে, সামাজিক জীবন যাপনের জন্য মানুষ পরস্পরের মধ্যে কতগুলো বিচিত্র রকমের সম্পর্ক স্থাপন করে। সেসব সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজে কতগুলি মোটামুটি স্থায়ী পদ্ধতি গড়ে ওঠে। এসব পদ্ধতিসমূহের অনুমোদিত রীতি অনুযায়ী মানুষ পরস্পরের সাথে আচরণ করে থাকে। এসব পদ্ধতিসমূহকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। সমাজে মোটামুটি নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধান ঃ—১. সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ২. ধর্ম ৩. বিবাহ ৪. পরিবার ৫. রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ৬. শিক্ষা ৭. বিনোদন।

সম্পর্কের প্রকৃতি, লিঙ্গ, বয়স, বাসস্থান, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষকে নানা প্রকার দলে বিভক্ত করা যায়। এগুলোকে সমাজ বিজ্ঞানীর ভাষায় সামাজিক দল বলা হয়।

সম্পর্কের প্রকৃতি অনুযায়ী সমাজ বিজ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষ দল Primary group অপ্রত্যক্ষ দল—Secondary group (cooley), অন্তর্মুখী দল—In group ও বহির্মুখী দল—Out group (sumner)

www.pathagar.com

গ্রামীণ দল—'অহসী' ও শহুরে দল—'হজর' (ইবনে খলদুন) প্রভৃতি ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী মরিস্ জিন্স বার্গ ও বটমোরসহ কয়েক-জন সমাজ বিজ্ঞানী সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক দলের সমন্বিত রূপকে সামাজিক কাঠামোরূপে বর্ণনা করেছেন।

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো বুঝতে হলে এদেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও দলসমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ধর্ম : প্রত্যেক সমাজেরই একটি স্পর্শকাতর স্নায়ুকেন্দ্র থাকে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ বিজ্ঞানের জনক ডঃ নাজমুল করিমের মতে বাংগালী সমাজের স্পর্শকাতর স্নায়ুকেন্দ্র হোল ধর্ম। তিনি বলেছেন. এতদ্দেশীয় সমাজকে ঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে দর্শন পদ্ধতিতে অর্থাৎ ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গবেষণা করতে হবে। (ডঃ নাজমুল করিম : নিখিল পাকিস্তান সমাজ বিজ্ঞান সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ দ্রঃ)।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মানুষ সাধারণভাবে ধর্মপরায়ণ। এ দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধে সামান্য স্পর্শ করলে সমাজে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে মুসলমান, হিন্দু, খৃস্টান ও বৌদ্ধ সকলের প্রতিক্রিয়া একই প্রকার। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তব-তায় ধর্ম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে চারটি প্রধান ধর্মানুসারী রয়েছে। ইসলাম, হিন্দু, খৃস্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম এদেশের মানুষের প্রধান ধর্ম।

এ দেশে ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের সংখ্যা সর্বাধিক। মোট জনসংখ্যার ৮৫'৩৯% ভাগ মুসলমান। সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়ার পরই মুসলিম প্রধান দেশ। পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের মানুষের ইসলাম ধর্ম গ্রহ-ণের নৃতাত্ত্বিক আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা পূর্বেই বলেছি, বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকালে আদি অস্ট্রেলয়েড্ জনগোষ্ঠী বাস করত। ধর্মে তারা ছিল প্রকৃতি পূজারী। পূর্ব ও পশ্চিম দিক হতে এদেশের জন গোষ্ঠীর সাথে মিশে গিয়ে আজকের বাংগালী জাতির সৃষ্টি হয়ে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধর্মও এদেশে এসেছে। এসব ধর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে আর্য বা হিন্দু ধর্ম। তবে ঐতিহাসিকদের মতে আজকের বাংলাদেশে আর্য ধর্ম কখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বে এ দেশের মানুষ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি পূজারী ছিল। তবে প্রকৃতি পূজা ও হিন্দু ধর্মের মাঝে পার্থক্য এত কম যে, এ দুটোকে পৃথক করে দেখা বড় কঠিন।

বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের সাথে সাথে বাংগালী জাতি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ও একটি শক্তিশালী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বঙ্গ সাম্রাজ্যের সীমানা তিব্বত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কালের প্রবাহে বৌদ্ধ রাজশক্তির পতন ঘটে ও চরম জাতি ভেদে বিশ্বাসী সেন বংশের উত্থান ঘটে। সেন রাজারাই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের জাতি-ভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠা করে। সেন বংশের রাজত্ব কালেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বাংলাদেশে সেনবংশ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারকারী দরবেশগণ বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। বৌদ্ধ রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী জেলার সোমপুর বিহারে আরবী ভাষায় 'আল্লাহ' ও 'মোহাম্মদ (দঃ) খচিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। ডঃ এনামুল হকের মতে সোমপুর বিহারে প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা ইসলাম প্রচারক দরবেশ কর্তৃক আনীত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কয়েকশত বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয় ও বাংগালিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ আরম্ভ করে। আমরা নিম্নে কয়েক জন মুসলিম সাধকের নাম উল্লেখ করলাম' যাঁরা বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইসলাম প্রচার করেছিলেন ঃ

শাহ্ মোহাম্মদ রুমী (নেত্রকোণা, ১০৫৩ সাল), বাবা আদম শহীদ (বিক্রমপুর, ১১৫৮), মখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ (পাবনা, আনুমানিক ১২৪০), জালালুদ্দিন তাবরিজী (মালদহ, ১০১২), শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্) (ঢাকা শহর), শাহ মাহ্মুদ গজনবী (বর্ধমান, ১২০১-১২১০), শাহ্ মখদুম রূপোশ (রাজশাহী, ১১৮৫), বায়েজীদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম, ৮৭৪ সালের পূর্বে), শেখ ফরিদ উদ্দিন (১২৬৯) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত সাধকগণ হিন্দু রাজাদের শাসন আমলেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তাছাড়া আরো বহু দরবেশ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ২৯ জনের মাজার ও পরিচিত পাওয়া যাওয়া যায়, যাঁরা হিন্দু শাসকদের শত নির্যাতনের মুখে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। এঁদের মধ্যে সিলেটের প্রখ্যাত সাধক হযরত শাহ্ জালাল ও তাঁর ৩৬০ জন শিষ্য রয়েছেন।

যা হোক, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের মানুষ রাজানুকূল্য পাওয়ার লোভে বা কারো ভয়ে ভীত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। ইসলামের সাম্য মৈত্রে আকৃষ্ট হয়েই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল। মুসলিম শাসন অবসানের একশত বৎসর পরেও ঢাকা জেলায় মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী ছিল। নীচের তথ্য হতে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

১৮৫৭-৬০ সালে এক গণনায় ঢাকা জেলার লোকসংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়া যায়:

হিন্দু	—	৪,৫৫,১৮২
মুসলিম	—	৪,৪৯২২৩
খৃস্টান	—	২১০
মোট		৯,০৪,৬১১

অথচ মাত্র ১২ বৎসর পর ১৮৭২ সালের গণনায় ঢাকা জেলায় মুসলিম সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে বেশী দেখা গিয়েছে। উক্ত গণনায় হিন্দুদের হার হয়েছিল ৪৩·৩% আর মুসলমানদের হার ছিল ৪৬·৫%।

(Iames Wise : Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, 1885 P—4-5।)

এত অধিক হারে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জেমস্ ওয়াইজ বলেছেন। "These figures all point to the conclusion that, it is to a change of religion, and not to the immigration of any Muhammadan race, that the exis-

www.pathagar.com

ting predominance of the Musalman element in Eastern Bengal is due.

"………The most Potent influence undoubtedly at the present day is the attraction of Islam itself. (একই গ্রন্থ : পৃ—৫)।

পলাশী যুদ্ধের একশত বৎসর পর ইংরেজ কর্তৃক লিখিত উপরোক্ত বক্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, এদেশের মুসলমানগণ বাংলার ভূমিজ সন্তান এবং ইসলামের নিজস্ব আকর্ষণে খৃস্টান রাজত্বকালেই তারা অধিকতর সংখ্যায় মুসলমান হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলিম জনগণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা পূর্বেই তাদের হার উল্লেখ করেছি। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো বুঝাতে হলে প্রধানত বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের সামাজিক কাঠামো জানতে হবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ডঃ নাজমুল করিমের মতে বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে পৃথকভাবে গবেষণা করতে হবে (পূর্বোক্ত সূত্র)।

বাংলাদেশের মুসলমানরা প্রধানত সুন্নী জামাতের ইমাম আবু হানিফার অনুসারী। ইমাম শায়েফী মালেকী ও হাম্বলীর অনুসারী বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। শিয়া জামাতের সদস্যও এদেশে খুবই কম। শিয়াগণ বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়। বাংলাদেশে কিছু কাদিয়ানী আছে। মোহাম্মদপুরে শিয়া মসজিদ ও বকশী বাজারে কাদিয়ানী প্রচার কেন্দ্র আছে। বাংলাদেশে সামান্য আগাখানী আছে। এরা প্রধানত বিদেশী ব্যবসায়ী। পুরানা পল্টনে আগাখানীদের বিরাট জামাতখানা আছে। সুন্নী জামাতের সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। তবে হানাফী ও আহালে হাদীসপন্থীদের মধ্যে কোন পার্থক্য ও মতবিরোধ নেই। তারা পরস্পরের ইমামতিতে নামাজ পড়ে। বিয়াশাদী খানাপিনা ও তাদের পরস্পরের সাথে চলে। বাংলাদেশে মুসলমানদের উপর পীর-আওলিয়া ও মাজারের বেশ প্রভাব আছে। খাজা মঈন উদ্দিন চিস্তির প্রচুর ভক্ত বাংলাদেশে রয়েছে। চট্টগ্রামের বায়েজীদ বোস্তামী, আমানত

www.pathagar.com

শাহ্ ও সিলেটের শাহ্ জালালের মাজার বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ দরগাহ্। ঢাকা শহরে অসংখ্য মাজার রয়েছে। তন্মধ্যে হাইকোর্টের মাজার ও মীরপুর মাজার বিখ্যাত। জীবিত পীরদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় আটরশীর পীর সাহেব। তাঁর কেন্দ্র ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত। তিনি তাঁর কেন্দ্রকে বিশ্ব জাকের মঞ্জিলরূপে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর অনুসারিগণ পরস্পরকে "জাকের ভাই"রূপে সম্বোধন করেন। 'তবলীগ জামাত' বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এটা একটি আন্তর্জাতিক ইসলাম প্রচার সংস্থা। প্রতিবছর শীতকালে ঢাকার উপকন্ঠে টঙ্গি শহরে জামাত তবলীগ-এর ভক্তদের একটি সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম দেশ হতে প্রখ্যাত আলেমগণ যোগদান করে থাকেন। একমাত্র হজ্ব ছাড়া পৃথিবীর কোথাও এত মুসলমানের সমাবেশ হয় না।

বাংগালী মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হোল সামাজিক সৌহার্দ্যতা। আশরাফ-আতরাফের শ্রেণী সংঘাত বাংলাদেশে নেই। বাংগালী মুসলমানদের পারিবারিক পদবীর প্রচলন নেই বললেই চলে। ভারত ও পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের দেখাদেখি পারিবারিক পদবী ব্যবহারে ও তার মাধ্যমে মর্যাদা নির্ণয়ের প্রবণতা রয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এ প্রবণতা খুবই কম। বাঙ্গালী মুসলিম মহিলারা স্বামীর ও সন্তানরা পিতার নামের একাংশ নিজের নামের সাথে ব্যবহার করে থাকে। যেমন সাদেকা সফিউল্লাহ্ বা আবুল কাসেম আযাদ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বা পরিবারের কেউ বংশগত বা পারিবারিক পদবী ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায় নি। বরং তারা পিতার নামের অংশকে নিজের পরিচয়ের জন্য ব্যবহার করেছেন। যেমন, মোহাম্মদ (দঃ) ইবনে আবদুল্লাহ্ বা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মোতালিব অথবা ওমর ইবনে খাত্তাব বা আলী ইবনে আবু তালিব। অবশ্য আরবের তাই রীতি।

বাংগালী মুসলমানদের কেউ কেউ পারিবারিক পদবী ব্যবহার করে থাকে। এসব পদবীর মধ্যে শেখ, কাজী, মুন্সী, বিশ্বাস, সরকার,

www.pathagar.com

শাহ্, মিয়া, সৈয়দ, খাঁন প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু সামাজিক লেন-দেন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসব পদবী কোন তাৎপর্য বহন করে না। মুসলমানদের পদবীকে কোনক্রমেই হিন্দুদের বর্ণ প্রথার সাথে তুলনা করা যায় না। বাংগালী মুসলমানগণ সাধারণত ধর্মভীরু। বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষ মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র বায়তুল মুকাররম মসজিদ সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। বাকী সব মসজিদ জনগণের চাঁদায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

কিছুদিন পূর্বেও বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার বেশ প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখার প্রবণতা বাঙ্গালী মুসলমানাদর মাঝে বেশ হ্রাস পেয়েছে। তবে তালাকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তবুও বাঙ্গালী হিন্দুদের তুলনায় বাঙ্গালী মুসলমানদের মাঝে তালাকের হার বেশ কম।

১৯৮১ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী জেলায় পরিচালিত এক জরীপে তালাকের হার নিম্নরূপ দেখা গেছে ঃ

বয়স	ঢাকা	চট্টগ্রাম	খুলনা	রাজশাহী
৩৫-৩৯	১.৯	২.৪	১.৬	২.১

শহরে	গ্রামে	মুসলিম	হিন্দু
০.৫	২.৩	২.০	২.৫

(Statistical year book of Bangladesh-1981, P-64,)

উপরোক্ত সংখ্যাতত্ত্ব হতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে তালাকের হার বেশী। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তালকের হারও বেশ বৃদ্ধি পায়। ৬০ ও তদূর্ধ্ব বয়সী মুসলিম মহিলাদের শতকরা ১০.৫ জন ও হিন্দু মহিলাদের শতকরা ১৬.৪ জন তালাকপ্রাপ্তা। উপরোক্ত তথ্যে প্রকাশ পায় যে, শহর অপেক্ষা গ্রামে তালাকের হার অনেক বেশী। উপরের চিত্রকে বাংলাদেশের সাধারণ অবস্থারূপে গণ্য করা যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংগালী মুসলমানগণ দোটানায় পড়ে আছে। এদেশে কয়েক হাজার মাদ্রাসা রয়েছে এবং তাতে কয়েক লক্ষ-ছাত্র অধ্যয়ন করে থাকে। এই শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

পরে আলোচনা করব। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, বাংগালী মুসলমানগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছে।

বাংগালী মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হোল যৌতুক প্রথা ও ভিক্ষাবৃত্তি। অতীতে সাধারণ মুসলমানদের বিবাহে যৌতুক প্রথা প্রায় অপরিচিত ছিল। বরং প্রায় ২০/৩০ বৎসর পুর্বে যশোহরের গ্রামীণ সমাজে পণ প্রথা বেশ প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কমবেশী পণ প্রথা দেখা যেত। কোথাও যৌতুক প্রদান বিবাহের আলোচনায় স্থান পেত না। ইদানীং পণ প্রথা সমাজ হতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়েছে। যৌতুক প্রথা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, শহুরে গ্রামীণ, মোট কথা সমাজের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। যৌতুক সাধারণত হিন্দু সমাজের প্রথা। হিন্দু মেয়েরা বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হওয়ার কারণে, বিয়ের সময়ে পিতা কন্যাকে যৌতুক হিসাবে তার সম্পত্তির অংশ প্রদান করত। এভাবে হিন্দু সমাজে যৌতুক প্রথার উৎপত্তি ঘটে। মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথম দিকে শখ ও ফ্যাসনরূপে অনুপ্রবেশ করে। ধীরে ধীরে এ প্রথা অত্যন্ত গভীরভাবে সমাজে শিকড় গেড়েছে। তবুও যৌতুক প্রথাকে মুসলিম বিবাহে একটি অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে বিবেচনা করা যায় না। কারণ কন্যাপক্ষের যৌতুকের পরিমাণের সাথে বরপক্ষের দেয় গহনাপত্র ও কাবীনের পরিমাণের ব্যাপারে দরকষাকষি হয়ে থাকে। এখনও এদেশের সাধারণ মুসলমানগণ যৌতুক বা পণ উভয় প্রথাকে অনৈসলামিক ও গর্হিত মনে করে। হিন্দু সমাজে উপরে বর্ণিত বিষয়ের কোনটাই নেই।

যা হোক, এটা অনস্বীকার্য যে, যৌতুক প্রথা বাংগালী মুসলিম সমাজে মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিরূপে দেখা দিয়েছে।

বাংগালী মুসলিম সমাজে আরেকটি প্রধান সমস্যা হোল ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষা-বৃত্তিও অন্য সমাজ হতে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। হিন্দু সমাজে সংসার ত্যাগী বৈষ্ণব বা বৈরাগী ও বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষুদের বেশ সম্মানের চোখে দেখা হয়। কিন্তু ইসলামে সন্ন্যাসী জীবন বা পরশ্রমে নির্ভর জীবনের কোন স্থান নেই। পবিত্র কোরানে নিজ নিজ জীবিকার প্রয়োজনে পরিশ্রম করার জন্য প্রত্যেক মানুষের প্রতি

www.pathagar.com

নির্দেশ রয়েছে। তবুও বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজে কমবেশী ভিক্ষা - বৃত্তি রয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি রীতিমত একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ গ্রহণ করেছে। এর একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। নদীর ভাঙ্গন ও জমিদারের উচ্ছেদের ফলে বাস্তু ভিটা হারা বাংগালী মুসলমানদের জীবন ধারণের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী কোন ব্যবস্থা ছিল না। কারণ পেশাগতভাবে এদেশের মুসলমানগণ প্রধানত কৃষিজীবী। অন্যান্য পেশা বর্ণ প্রথা-ভিত্তিক হিন্দু সমাজের একচেটিয়া অধিকার ও দক্ষতা ছিল। কৃষিজীবী গ্রামীণ মুসলমানগণ শহরে এসে কায়িক শ্রমের কোন সুযোগও পেত না। ১৯৪২-৪৩ সালে আজকের মত রিক্সাও ছিল না, রিক্সায় চড়ার মত শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ছিল না। বাস্তুভিটাহারা গ্রামীণ মুসলিম মহিলারা শহরে ঝি চাকরানীর কাজ পেত না। কারণ তখন প্রচুর ঝি চাকরানী রাখার মত শহরে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেনি। এসব কারণে দারিদ্র্যের প্রান্তিক সীমা অতিক্রমকারী মুসলিম জনতা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ভিক্ষাদানে সক্ষম মুসলমানেরা পরকালের আশায় ও স্বধর্মীদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে যথাসাধ্য ভিক্ষাদান করতো। এভাবে বাংগালী মুসলিম সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি একটি প্রকট সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের ভিক্ষুক সমস্যা আজো ভারতের ন্যায় প্রকট হয়ে উঠেনি। ভারতের বোম্বে ও দিল্লী শহরে ভিক্ষুকেরা একটি সংগঠিত শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বোম্বে ও দিল্লী শহরে ভিক্ষুক সমাজের নেতা নির্বাচিত হয় ও উক্ত নির্বাচনের পদপ্রার্থীদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। ভারতে ভিক্ষা বৃত্তির আড়ালে নারী ব্যবসা, মাদক দ্রব্যের চোরা চালানী ও অন্যান্য সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এখনো ভিক্ষাবৃত্তি একটি একক সমস্যাই রয়েছে—অন্য সমস্যার জন্ম দেয়নি।

অধুনা ছিন্নমূল পুণর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের মাধমে ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের চেষ্টা করা হচ্ছে। কোন জরীপ না হওয়া সত্ত্বেও বলা যায়, বাংলাদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা খুব ধীরে হলেও কমছে। অন্তত জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির সাথে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে না।

www.pathagar.com

এবার বাঙ্গালী মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশের মুসলমানগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ত্রিশ রোজা ও হজব্রত পালন করে থাকে। তারা তাদের পুত্র সন্তানদের অবশ্যই খৎনা করিয়ে থাকে। বিপদাপদ হতে মুক্তির লক্ষ্যে বা কোন শুভ কামনায় বাংলাদেশের মুসলমানরা মিলাদ পড়ে থাকে। "মিলাদ" বাংগালী মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাছাড়া অনাবৃষ্টি, মহামারী, ফসল হানিসহ বড় রকমের বিপদাপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য "বড় খতম" বা সোয়া লক্ষ বার দোয়া ইউনুস পড়া হয়। ঢাকা শহরে মাইক যোগে কোরান শরীফ খতম করাও একটি প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

বাংগালী মুসলিম সমাজের সামাজিক সংহতি, সহনশীলতা ও পর ধর্মে সহিষ্ণুতা আমাদের একটি বড় সম্পদ। ভারতের হরিজন বনাম বর্ণ হিন্দু, হিন্দু বনাম মুসলিম, হিন্দু বনাম শিখ বা পাকিস্তানের শিয়া সুন্নি বা সুন্নি কাদিয়ানীর মত সামাজিক সংকট বাংলাদেশে নেই। এ সব সামাজিক দ্বন্দ্বে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের আপাত লাভ হয়। কিন্তু দেশের জন্য সুদূর প্রসারী দুর্যোগ বয়ে আনে। মোট কথা বাংগালী মুসলিম সমাজের সামাজিক কাঠামো আমাদের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ।

হিন্দু ধর্ম ঃ বাংলাদেশের হিন্দুদের দুইটি পৃথক সম্প্রদায়রূপে গণনা করা হয়। বর্ণ হিন্দু ও তপসিলী সম্প্রদায়। ভারতেও বর্ণ হিন্দু ও অচ্ছ্যুৎ হিন্দুদের পৃথকভাবে গণনা করা হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৬·৮৯% ভাগ বর্ণ হিন্দু ও ৬·৬৪% তপসিলী হিন্দু। বর্ণ হিন্দু ও তপসিলী হিন্দু মিলিতভাবে আমাদের মোট জন সংখ্যার শতকরা ১৩·৫৩ ভাগ (Statistical year book of Bangladesh 1975-P 39)

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে চন্দ্রনাথ ও মহিষখালীর আদিনাথ মন্দির বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। দুর্গাপূজা এদেশের হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। তবে আর্থিক কারণে পূর্বের ন্যায় অধিক হারে বাংলাদেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় না। এদেশের হিন্দুরা সর্বাধিক লক্ষ্মী পূজা করে থাকে। লক্ষ্মী সৌভাগ্যের প্রতীক। স্বরসতী বিদ্যার

www.pathagar.com

প্রতীক। বিদ্যার্থীরা শিক্ষাঙ্গণে স্বরসতী পূজার আয়োজন করে থাকে। কালী পূজাও বাংগালী হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাছাড়া প্রতি পরিবারের একজন কুল দেবতা আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কুল দেবতাকে ভোগ দেওয়া হয়। হিন্দুরা এই প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানকে "সন্ধ্যা" বলে। মেয়েরা "সান্ধ্য" দিয়ে থাকে। বয়স্ক পুরুষগণ আহ্নিক করে থাকে। বাংগালী হিন্দুদের পূজা মূলত আচার প্রধান। অ চারের প্রধান উপকরণ হোল ফুল ধূপ ও গঙ্গাজল। সান্ধ্য পূজায় কোন মন্ত্র পাঠের ব্যাপার আছে বলে মনে হয় না। কারণ যে কোন বয়সের যে কোন একজন মেয়ে কুল দেবতার মূর্তি বা ছবির সামনে কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করলেই সকলের কর্তব্য পালন করা হয়ে যায়। ঢাকা জেলার লাঙ্গল বন্দে অষ্টমী স্নান উপলক্ষে বাংলাদেশের হিন্দুদের সব চেয়ে বড় সমাবেশ হয়ে থাকে। চড়ক পূজা, গাজন নৃত্য ও রথ যাত্রা বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রিয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বিপদাপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাঙ্গালী হিন্দুরা সাধারণত "নাম যপ" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থান হতে আগত ভক্তের দল ঢোল করতাল সহযোগে "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ ঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" নাম বিচিত্র স্বরে জপে থাকে।

কুল দেবতার ব্যাপারে বড়ই বিচিত্র নিয়ম প্রচলিত আছে। কোন কোন পরিবার পৌরানিক দেবতাদের একজনকে কুল দেবতারূপে পূজা দিয়ে থাকে। আবার কোন কোন পরিবার জীবিত সাধু ব্যক্তিকে কুল দেবতার মর্যাদা দিয়ে থাকে। আমি গনেশ ঠাকুর, রাম কৃষ্ণ পরম হংস দেব ও একজন জীবিত মানুষকে কুল দেবতারূপে পূজা পেতে দেখেছি।

হিন্দুরা জাতিভেদ প্রথা দৃঢ়ভাবে মেনে চলে। কয়েকজন সমাজ বিজ্ঞানীর মতে জাতি ভেদ বা বর্ণ প্রথাই হোল হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি (E. Senart : Caste in India London 1930 দ্রঃ)। সমাজ বিজ্ঞানী বটমোর অবশ্য জাতি ভেদ ও বর্ণ প্রথাকে পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। (T. B. Bottomore : Sociology, P—183—188 দ্রঃ)। হিন্দু সামাজিক কাঠামো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে। আধুনিক সভ্য জগত জাতিভেদ প্রথার কঠোর সমালোচনা করে

www.pathagar.com

থাকে। স্বয়ং গান্ধী জাতি ভেদ প্রথা উচ্ছেদের জন্য সারা জীবন চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "The caste system as we know, is an anachronism. It must go if both Hinduism and India are to live and grow from day to day" (Discovery of India : P—110 footnote)

গান্ধীর রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বকে বাস্তবে রূপদানকারী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গান্ধীর উপরোক্ত মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে ভারতীয় হিন্দু সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি মূলে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সোপান। এটাকে বাদ দিয়ে হিন্দু সমাজের কথা চিন্তা করা যায় না। তিনি বলেছেন, "The caste system does not stand by itself ; it is a part, and an integral part, of a much larger scheme of social organisation, It may be possible to remove some of its obvious abuses and to lessen its rigidity, and yet to leave the system intact (J. Nehru: Discovery of India, P-242).

প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত নেহেরুসহ আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশ সদস্য সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন যে, মানবিক অধিকার মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, জাতিভেদ প্রথাভিত্তিক টোটালিটেরিয়ান পদ্ধতির মাধ্যমেই ভারত বাঁচতে পারে। তাই তারা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার ঘোর সমর্থক।

যা হোক, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজিক কাঠামোকে জাতিভেদ প্রথা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করতে হবে। এটা অনস্বীকার্য যে, বাঙ্গালী হিন্দুদের জীবন ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ অত্র দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুদের থেকে পৃথক। ইদানীং কালে বাঙ্গালী মুসলিম ও হিন্দু সমাজের বিচিছন্নতা বহুলাংশে দূরীভূত হয়েছে।

বাংগালী হিন্দু সমাজের সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যৌতুক প্রথা। এ প্রথা মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের জন্য বেশী প্রকট। হিন্দু সমাজে নারীদের সম্পত্তির উপর উত্তাধিকার সূত্রে মালিকানা নেই। তাছাড়া হিন্দু আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র 'মনু সংহিতা'য় নারীদের মানবিক মর্যাদা পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত

www.pathagar.com

জহরলাল নেহেরু বলেন, "The legal position of woman according to Manu, the earlist exponent of the law, was definitely bad. They were always depended on some body—on the father, the husband, or the son. They were treated in law, almost as chattel."

(J. Nehru : Discovery of India, P—107)।

মনু সংহিতাই বাংগালী হিন্দুদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আইন গ্রন্থ। এ গ্রন্থ হিন্দু নারীদের অস্থাবর সম্পত্তি রূপে বিবেচনা করে থাকে। এ ধারণার ভিত্তিতেই হিন্দু সমাজে যৌতুক প্রথার উৎপত্তি হয়েছে। যা হোক এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

বাঙ্গালী হিন্দুদের আরেকটি সমস্যা হোল সিদ্ধান্তহীনতা ও পলায়নী মনোভাব। ১৯৪৭ সালের পর হতে বাঙ্গালী হিন্দুদের মাঝে এদেশ ত্যাগ করার মনোভাব দেখা দেয়। তারা ভারতে স্থান করে নেওয়াকে পরম লক্ষ্যরূপে বিবেচনা করতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে তারা কোন বড় ব্যবসা, শিল্প কারখানা এমন কি সুন্দর বাসস্থান তৈরী করতেও উৎসাহী হয়নি। আবার ভারতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সকলের হয় না। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত জীবন ত্যাগ করে অনিশ্চিত জীবনের উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করাও সবাই সমীচীন মনে করে নি। এই সিদ্ধান্তহীনতা ও পলায়নী মনোভাব বাংলাদেশের হিন্দুদের একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তাদের এ মনোভাবের খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি। অথচ বাংগালী মুসলমানদের মনোভাবে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। তারা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করেছে, ১৯৫৪ সালে আদমজী নগরে বিহারী মুসলমানদের সাথে দাঙ্গা করেছে, ১৯৬৪ সালে হিন্দু বিহারী দাঙ্গায় বাঙ্গালী হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছে এবং ১৯৭১ সালে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে। অবশ্য বাঙ্গালী হিন্দুদের মনে এ ধরনের উৎকন্ঠা ও অবিশ্বাস জিইয়ে রাখার পেছনে ভারতের বিশেষ মহলের কারসাজি রয়েছে। কতিপয় ভারতীয় পত্রিকার প্রচার প্রোপাগাণ্ডা দেখলেই তা বুঝা যায়। যা হোক সবার অলক্ষ্যে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্ধুরূপী

www.pathagar.com

প্রকৃত শত্রুর মত ষড়যন্ত্রেও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অগ্রযাত্রাকে রোধ করা যাচ্ছে না।

খৃস্টান

বাংলাদেশে মোট ২,১৬০০০ জন খৃস্টান আছে। এরা মোট জন সংখ্যার ০'৩১ ভাগ। আমাদের দেশে দুই প্রকারের খৃস্ট সম্প্রদায় রয়েছে—ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট। প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে আবার নানা ভাগ রয়েছে। ক্যাথলিকগণ অপেক্ষকৃত গোঁড়াপন্থী। ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের নারী ও সংসার বিবর্জিত জীবন যাপন করতে হয়। অবশ্য সংসার বিবর্জিতা অনেক মহিলা ধর্ম যাজিকাও ক্যাথলিক চার্চের অনুশাসন মেনে থাকেন। ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত চার্চ বাংলাদেশের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। এদেশে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট উভয় সম্প্রদায়ের পথক চার্চ রয়েছে। উভয় সম্প্রদায় রবিবার দিন সাপ্তাহিক প্রার্থনায় মিলিত হয়। খৃস্টানগণ সাধারণত সংগীতের মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকে। খৃস্টান সম্প্রদায় বাংলাদেশে স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন এবং অন্যান্য সেবা মূলক কাজের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করে থাকে।

ক্যাথালিকদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা নেই। একবার বিবাহ হলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আজীবন তা রক্ষা করতে হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও ক্যাথলিকগণ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে থাকে। ক্যাথলিক চার্চ একটি রাষ্ট্রীয় শাসনের ন্যায় কঠোর নিয়ম শৃংখলার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইটালীর ভ্যাটিকান সিটি (পৃথিবীর একমাত্র ক্যাথালিক রাষ্ট্র) হতে ক্যাথালিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু পোপের নির্দেশে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, বাংলাদেশের ক্যাথালিক চার্চ ও মিশনগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে।

খৃস্ট সমাজে মেয়েরা পুরুষদের সমান সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকে। রবিবারের প্রার্থনায় চার্চে মেয়েরা পুরুষদের পাশে বসে প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়ে থাকে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলামের ন্যায় খৃস্ট ধর্মে কোন ধর্মীয় অনুশাসন নেই। তবে

www.pathagar.com

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কন্যা সন্তানগণ পুত্র সন্তানদের সমান পিতার সম্পত্তির মালিক হয়। রোমান ক্যাথলিকদের তালাক ও একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রী-পুরুষ কেহই কাহাকে তালাক দিতে পারেনা। খৃষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় পর্বগুলো হলো খৃষ্টমাস-ডে গুড-ফ্রাই-ডে ও ইষ্টার-ডে। বাংলাদেশে সর্ব প্রথম পর্তুগীজগণ খৃষ্টধর্ম প্রচার করে। এ কারনে এদেশের খৃষ্টানদের নামে পর্তুগীজ পদবীর বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের খৃষ্টানদের বিশেষ কোন সামাজিক সংকট আছে বলে জানা যায় না।

বৌদ্ধ ঃ—বাংলাদেশের জন সংখ্যার মোট ০'৬১% ভাগ বৌদ্ধ। দেশের পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধগণ অধিকহারে বাস করে থাকেন। এক-কালে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। বাংলাদেশে এ যাবৎ আবিস্কৃত পুরাকীতির অধিকাংশ বৌদ্ধদের অবদান। শংরা-চার্যের সামাজিক আন্দোলন ও সেন রাজাদের অত্যাচারে বাংলাদেশ হতে বৌদ্ধগণ একপ্রকার নির্বাসিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ থেরোবাদী। ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দির বৌদ্ধদের একটি বিখ্যাত উপসনালয়। "অহিংস পরম ধর্ম" বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্ম রূপে যে ধারণা প্রচলিত আছে, অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত তা সঠিক নয় বলে মনে করেন। তাদের মতে, এক কথায় বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্ম বুঝতে হলে, স্বীকার করতে হবে, "সকল প্রাণীরই আহার গ্রহণ করে বাঁচার অধিকার আছে।"

বৌদ্ধ সমাজে দুই প্রকারের জীবন আছে; গৃহী জীবন ও ভিক্ষু জীবন। বৌদ্ধদের ধর্মমন্দিরকে আশ্রম বলা হয়। ধমযাজকদের ভিক্ষু বলা হয়। ভিক্ষুগণ আশ্রমে কঠোর সন্যাস জীবন যাপন করে। বোদ্ধ সমাজে বহু বিবাহ ও তালাক প্রথা নিষিদ্ধ নয়। মেয়েরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে না। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হোল বৌদ্ধ পূর্ণিমা। এদিনে "ভগবান তথাগত" জন্ম, জ্ঞান ও নির্বাণ লাভ করেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অধিকাংশ ধর্মীয় পার্বন পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে হয়। গৃহী বৌদ্ধরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুদের দান দক্ষিণা করে থাকে। ভিক্ষুগণ নারী বিবর্জিত জীবন

www.pathagar.com

যাপন করে থাকে। তারা হলুদে ছোপানো বস্ত্র পরিধান ও মাথা মুণ্ডন করে থাকে। চট্টগ্রামের সমভূমিতে বাসকারী অধিকাংশ বৌদ্ধ বড়ুয়া পদবী ব্যবহার করে। পাহাড়ী এলাকায় বাসকারী বৌদ্ধদের বিচিত্র রকমের পদবী রয়েছে। কক্সবাজার, টেকনাফ ও মহেশখালী এলাকায় কিছু বার্মিজ বৌদ্ধ আছে। যাহোক বংলাদেশের বৌদ্ধদের কোন বিশেষ সামাজিক সংকট নেই।

এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমাদের সামাজিক কাঠামোর বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

এবার আমরা সংক্ষেপে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করব।

সম্পত্তি ঃ—সাধারণ ভাবে সম্পদকে সম্পত্তি বলা হয়। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় সম্পদ নয়—সম্পদের মালিকানার পদ্ধতিকে সম্পত্তি (Property) বলা হয়।

প্রকৃত পক্ষে উত্তরাধিকারের, ভোগের, দখলের, বিক্রীর, হস্তান্তরের, ও বন্ধকীর ক্ষমতা এবং নিয়ম পদ্ধতিকে সম্পত্তি বলা যায় (Universal Dictionary দ্রঃ)। আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয় সমূহ ছাড়াও আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রথা সমূহকেও সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করে দেখব।

বাংলাদেশে প্রতিটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্ব উত্তরাধিকারের প্রথা প্রচলিত আছে। এসব প্রথা রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা পেয়েছে। মুসলিম সমাজে কেউ মারা গেলে ও তার ঋণ থাকলে তা শোধ করে বাকী সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশ স্ত্রী ও $\frac{১}{৮}$ অংশ জীবিত পিতা-মাতা ও বাকী সম্পত্তি সন্তানগণ পায়। সন্তানগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম হোল, দুই কন্যায় সমান এক পুত্র পাবে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যদি ২ পুত্র ও দুই কন্যা রেখে মারা যায়, তবে তার সন্তানদের প্রাপ্য সম্পত্তি মোট ছয় ভাগ হবে। উক্ত ছয় ভাগের চার ভাগ পাবে দুই পুত্র ও দুই ভাগ পাবে দুই কন্যা।

www.pathagar.com

হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্র কোন সম্পত্তির মালিক হয় না।

খৃষ্ট সমাজে ছেলে ও মেয়ে বাপের সম্পত্তির সমান মালিক। স্ত্রী মৃত স্বামীর 'সোয়া পাঁচ আনা' সম্পত্তি পেয়ে থাকে।

উপরে বর্ণিত উত্তরাধিকার প্রথা ছাড়া বাংলাদেশের উপজাতি সমূহের মধ্যে বিচিত্র রকমের উত্তরাধিকার প্রথা রয়েছে।

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ব্যাংক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী আছে। এগুলো প্রতিষ্ঠানিক অর্থ লগ্নি সংস্থা। কিছুদিন পূর্বে মহাজনী প্রথা বাংলাদেশে প্রধান অর্থ লগ্নি প্রতিষ্ঠান ছিল। ছোট বড় হাজার হাজার মহাজন গ্রামীন জনগণকে মূল্যবান দ্রব্য আমানতের বিনিময়ে অতি উচ্চ সুদে ঋণ প্রদান করত। সুদের সাধারণ হার ছিল প্রতি মাসে, প্রতি টাকায় দুই আনা। অর্থাৎ বার্ষিক হার ১৫০%। কৃষি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা গ্রাম পর্য্যায়ে সম্প্রসারিত হওয়ায় অতি দ্রুত মহজনী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বন্ধকী প্রথা গ্রামীন বাংলার আর একটি অন্যতম অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সংস্থা। এ প্রথায় চাষের জমি বা বাস্তু ভিটা বন্ধক রেখে নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়। যেমন, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা প্রদানকারীর নিকট জমি বন্ধক থাকে। টাকা প্রদানকারী বন্ধকী জমির ফসল ভোগ করে। মেয়াদ শেষে মালিক জমি ফেরৎ পায়। আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি বন্ধক থাকে, এবং উক্ত সময়ের মধ্যে ঋণকৃত টাকা পরিশোধ করে বন্ধকী জমী মুক্ত করতে না পারলে, ঋণ দাতা জমির মালিক হয়ে যায়। এ প্রথায় বহু কৃষক পরিবার সর্বশান্ত হয়ে গেছে। শেরে বাংলা ফজলুল হক ঋণ শালিসী বোর্ডের মাধ্যমে ঋণগ্রস্থ বাংগালী কৃষক কুলকে ঋণ মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। ইদানীং কালে এ বন্ধকী প্রথাও বিলুপ্তির পথে।

বাংলাদেশের ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা প্রথাই প্রবল। তবে কিছু কিছু জমি আছে যার উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা রয়েছে। যেমন সব জাতীয় বন, নদ-নদী, রাষ্ট্রীয় খামার ইত্যাদি। আমাদের দেশে সকল প্রকার সম্পদের উপর সরকারের আধিপাত্য বিস্তারের প্রবল

www.pathagar.com

প্রবণতা রয়েছে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয়করণ নীতির ফলে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে।

বিবাহ ঃ—নর নারীর মাঝে সমাজের স্বীকৃত যৌন সম্পর্ককে বিবাহ বলা হয়। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মর্গ্যানের মতে আদিতে নর-নারীর মাঝে অবাধ যৌন সম্পর্ক ছিল এবং নানা বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান বিবাহ প্রথার বিকাশ ঘটেছে।

বাংলাদেশে এক পত্নী বিবাহ প্রথাই প্রবল। তবে মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে একাধিক পত্নী বিবাহ প্রথা স্বীকৃত আছে। সম্প্রতি "মুসলিম পারিবারিক আইন" অনুযায়ী কোন ব্যক্তি প্রথম পত্নীর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বার দার গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমা পত্নীর অনুমতি লাগে। যাহোক একাধিক পত্নী বিবাহ প্রথা বর্তমানে দ্রুত বিলুপ্তির পথে। উপজাতিদের মাঝে বিচিত্র রকমের বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। গারোদের মাঝে 'পত্নী গমন' বিবাহ প্রথা আজো প্রচলিত আছে।

পরিবার ঃ—যে সংগঠনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম, প্রতিপালন, শিক্ষাদান ইত্যাদি কর্ম সম্পাদিত হয় তাকে পরিবার বলা হয়। পরিবারকে সম্পদের মালিকানা ও স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশে পিতৃ প্রধান পরিবার ও এক স্বামী এক স্ত্রী পরিবারই প্রধান। পরিবারের সংখ্যা ও বাসস্থান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা ঃ—যে পদ্ধতিতে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরন করা হয় তাকে "শিক্ষা" বলা যায়।

বাংলাদেশে দুই প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে—প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসা সমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা যায়। গৃহ শিক্ষা ব্যবস্থা, মকতব ইত্যাদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যায়।

রাষ্ট্র ঃ—সকল প্রকারের রাজনৈতিক প্রশানিক সংস্থাকে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। আমাদের দেশে ইউনিয়ন কাউ-

www.pathagar.com

িসল সর্বনিম্ন পর্য্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সর্বোচ্চ পর্য্যায়ে জাতীয় সরকার। বর্তমানে জাতীয় সংসদ না থাকায় এসম্পর্কে আলোচনা করলাম না। উন্নীত থানা প্রশাসন সম্পর্কে এখনো সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া না যাওয়ায় এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা গেল না।

চিত্ত বিনোদন ঃ—যে পদ্ধতিতে মানুষ অবসর সময় কাটায় ও দেহ-মনের অবসাদ দূর করে, তাকে চিত্ত বিনোদন বলে। আমাদের দেশে ফুটবল খেলা, পার্কে বেড়ানো, সিনেমা ও টেলিভিশন দর্শন ইত্যাদি শহুরে চিত্ত বিনোদন সংস্থা। গ্রামে হা-ডু-ডু ও গোল্লাছুট খেলা, জারী ও যাত্রা গান ইত্যাদি প্রধান চিত্ত বিনোদন সংস্থা। শহর ও গ্রাম উভয় সমাজে চিত্ত বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হোল গল্প গুজব করা।

সামাজিক শ্রেণী ঃ—সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে সামাজিক শ্রেণীসমূহকে আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শেণীই প্রবল। আমরা এ গ্রন্থের প্রথম দিকে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের হার উল্লেখ করেছি। এদেশে বৃহৎ পুজিপতি পরিবার নেই বললেই চলে। উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায় কিছু জোতদার আছে। একথা অনস্বীকার্য্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী সংকট স্পষ্ট এবং প্রকট নয়।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অংকনের চেষ্টা করেছি। এসম্পর্কে আরো ব্যাপক গবেষণা করা প্রয়োজন।

চাকমা উপজাতি-সমস্যা প্রসঙ্গে

আমরা ইতিপূর্বে বাংলাদেশের উপজাতি সমূহ সম্পর্কে সামান্য-আলোচনা করেছি। এপ্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কোন জাতির মূল ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি হতে উদ্ভূত, কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠিকে উক্ত জাতির উপজাতি বলা হয়। বাংলাদেশে এরূপ প্রায় ১৯টি ছোট বড় উপজাতি আছে।

www.pathagar.com

এদের মোট সংখ্যা ৬ লক্ষ ২৩ হাজার ২২৫ জন। এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপ-জাতিয় লোক সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৭২৮ জন। আমরা ইতিপূর্বে জেলা ওয়ারী উপজাতির সংখ্যা আলোচনা করেছি। প্রধান উপজাতি সম্পূহের নাম ও সংখ্যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এবার আমরা চাকমা উপজাতিকে কেন্দ্র করে একটি বিষয়ের কথা আলোচনা করব। বিষয়টিকে কোন ক্রমেই জাতীয় সমস্যার পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবুও দেশের প্রতিটি নাগরিকের এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আমরা বেশ কয়েকবার পত্রিকায় দেখেছি, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন স্থানে তথাকথিত 'শান্তি বাহিনী'র সদস্যদের সাথে বাংলা দেশ সীমান্ত রক্ষীদের সংঘর্ষ হয়েছে। এই সংবাদের মধ্যে-এ সমস্যার মূল রহস্য নিহিত রয়েছে। কাদের স্বার্থে ও উৎসাহে উপরোক্ত সং-গঠণের জন্ম হয়েছে তা উপজাতিসমূহ সহ আমাদের সকলের জানার প্রয়োজন আছে।

নাগা ও মিজোদের উপর অত্যাচারের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমূহের ভয়ানক ভারত ভীতি রয়েছে। তাই তারা ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানের বিজয় কামনা করেছিল। স্বাধীনতার পর পরই চাকমা রাজা ত্রিদীব রায় পাকিস্তানে চলে যান। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার সমস্ত চাষের জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এ আইন বলবৎ হয়েছিল। উপজাতি সমূহের সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের কোন জ্ঞান না থাকায় বা এ সম্পর্কে দূর দৃষ্টির অভাবে খাজনা মওকুফ সংক্রান্ত এ নির্দেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে একই ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এ সুযোগে একদল ভুইফোঁড় উপজাতীয় নেতা সাধারণ উপজাতি সমূহের মধ্যে জোর প্রচার করল। যেহেতু সরকারী খাজনা মাফ হয়ে গেছে, সেহেতু "পূণ্যাহ্" প্রদানও বন্ধ করতে হবে। "পূণ্যাহ" হোল খাজনার সাথে রাজা বা তার প্রতিনিধিকে দেয় অর্থ বা সামগ্রী। খাজনার চেয়ে 'পূণ্যাহ্'র পরিমান অবশ্যই কয়েক গুন বেশী। 'পূণ্যাহ', বন্ধের ফলে রাজ পরিবার ও উপজাতীয় অভিজাত শ্রেণী 'হেড ম্যান', 'কারবারী,' 'দেওয়ান' প্রভৃতি দারুণ

www.pathagar.com

ভাবে আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হোল। ফলে তারা তাদের ভাষায় 'ভারত পন্থী' বাংলাদেশ সরকারের উপর ভয়ানক চটে গেল। তাছাড়া ইংরেজ আমল হতেই সমভূমির অধিবাসীগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে আসছে। এদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ব্যবসায়ী। এসব ব্যবসায়ীগণ উপজাতীয়দের সরলতার সুযোগে মারাত্মক ভাবে ঠকাতো। স্বাধীনতার পর পরই পাকিস্তান সমর্থনের অভিযোগে উপজাতীয়দের দোকান লুট পাটসহ নানা প্রকারের অত্যাচার করা হয়। চাকমা রাজা পাকিস্তানে, পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্রধারী উপ-জাতীয় যুবকগণ পলাতক, খাজনা পূণ্যাহ্ বন্ধ। এধরণের নানা প্রকারের সমস্যার কারণে উপজাতীয়, বিশেষ করে চাক্মা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বৃদ্ধি পেল। এই মানসিক সংকটের সুযোগ নিল ভারত। ভারতীয় এজেন্টগণ প্রথম দিকে চীনের নকল প্রতিনিধি রূপে চাক্মা উপজা'তির দরদী সেজে বসল। আমাদের দেশের একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব হীন বক্তব্য-এ বিভ্রান্তিকে আরো জোরদার করল। উক্ত দলের সমর্থনে মানবেন্দ্র লারমা জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হোল। লারমা নানাভাবে চাকমা যুবকদের মনে এ ধারণার জন্ম দিতে সক্ষম হোল যে, বাংলাদেশের সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া গত্যান্তর নেই এবং সশস্ত্র সংগ্রামে তাদের সাথে একটি শক্তিশালী বন্ধুদেশ রয়েছে। এমন একটি সামাজিক পটভূমিকায় প্রথমে 'জন-সংহতি" ও পরে উক্ত "জন সংহতির" সশস্ত্র শাখা 'শান্তি বাহিনী' জন্ম নিল। ১৯৭৩/৭৪ সালে চাকমাদের নেতৃত্বে গঠিত উক্ত সশস্ত্র প্রতিষ্ঠান বেশ তৎপর হয়ে উঠল। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতি সমূহ শান্তি বাহিনীর প্রতি কিছুটা সংবেদনশীল হয়ে উঠল। ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশ সরকার চাকমা উপজাতি সমস্যা সমা-ধানে বেশ তৎপর হয়েছে। এসময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাস-কারী গারো উপজাতিকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি হোল, ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর কতিপয় ব্যাক্তি ভারতে পলায়ন করে। ভারত তাদের আশ্রয় দান করে ও ১৯৭১ সালের কায়দায় বাংলাদেশে সশস্ত্র সংঘর্ষ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। গারো যুবকদের "আদি স্থান' নামক রাষ্ট্র গঠনের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে

www.pathagar.com

সাহায্য করে। পলাতক ব্যক্তিগণ ভারতের সীমান্ত রক্ষীদের সহায়তায় ময়মনসিংহ অঞ্চলে একটি হাসপাতাল দখল করে। এদের সাথে কিছু বিপথগামী গারো যুবকও ছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালের অবস্থা ভিন্নরূপ হোল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অতি সহজেই বাংলাদেশ হতে দুষ্কৃতিকারীদের বিতাড়িত করে। দুষ্কৃতিকারীগণ আবার ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসময়ে কয়েকজন গারো যুবক আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। এদের মধ্যে দুই একজন টেলিভিশনের সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করে যে তথা কথিত 'আদি স্থান' গঠনের জন্য ভারত তাদের উৎসাহ ও সাহায্য দান করেছে। এ ঘটনা চাক্‌মা নেতৃবৃন্দের এক অংশের মধ্যে তাদের সমস্যা সম্পর্কে নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাদের অনেকেই মনে করতে থাকে যে, তারাও গারো উপজাতির মত ভারতীয় এজেন্টদের খপ্পরে পড়েছে। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় চাক্‌মাদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ঃ

১। ভারত কোন মতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমূহের স্বাধীনতা স্বীকার করবে না। তাই যদি করতো, তাহলে মিজো ও নাগাদের স্বাধীনতার দাবী অনেক আগেই মেনে নিতো।

২। স্বাধীনতার নামে ভারত তার এজেন্টদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়, যার ফলে বাংলাদেশ অন্যের সাহায্য কামনা করতে বাধ্য হয়।

যদি একবার বাংলাদেশ সাহায্য কামনা করে, তবে বন্ধুত্বের নামে ভারত সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে (২৫ বৎসরের মৈত্রী চুক্তিত রয়েছেই)।

৩। চাক্‌মা সমস্যা সমাধানের নামে ভারতীয় বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘাটি গাড়তে পারলে কাপ্তাই হ্রদের মাধ্যমে অতি সহজে সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম মিজো ও নাগা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা যায়। বাংলাদেশের, প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্র কব্জায় রাখা যায়, বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী বেতবুনিয়া উপগ্রহ কেন্দ্র কুক্ষিগত করা যায় এবং সর্বোপরি চট্টগ্রাম বন্দরসহ সমগ্র চট্টগ্রাম জেলার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা যায়। কারণ, কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৬০০ বর্গ মাইল ব্যাপী কাপ্তাই হ্রদে এত পানি সঞ্চিত আছে যে, কোনক্রমে

www.pathagar.com

কাপ্তাই বাঁধ ভেঙ্গে গেলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা মারাত্মক ভাবে প্লাবিত হয়ে যাবে ও স্রোতের তোড়ে চট্টগ্রাম বন্দর বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়ে যাবে। ১৯৭৪ সালে অত্যাধিক পানির চাপের অজুহাতে অস্বাভাবিক ভাবে পানি ছেড়ে এ সম্ভাবনার প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়েছে। চাকমা উপজাতি সমস্যা সমাধানের নামে ভারতীয় বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারলে বাংলাদেশের অবস্থা বড়শী গেলা মাছের মত হবে। চাকমাদের অবস্থা এমন সঙ্গীন হবে যে, তাদের অস্তিত্বই থাকবে না। কারণ, উপজাতীয় সমস্যা বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের জন্য অনেক বেশী প্রকট। সুতরাং ভারত চাকমাদের স্বাধীনতা দানের জন্য নয়, বরং নাগা-মিজোদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে নস্যাৎ ও বাংলাদেশকে হাতের কব্জায় পাওয়ার জন্য চাকমাদের সাহায্য করছে।

উপরোক্ত সন্দেহ ও সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে চাকমাদের মাঝে দারুণ মতানৈক্য দেখা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতি সমূহ নিজেদের ভারতীয় দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার না করার মানসে চাকমাদের নেতৃত্বে গঠিত "জন-সংহতি" ও 'শান্তি বাহিনী'র সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে। এমনকি চাকমা নেতৃবৃন্দের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা দিল। তাদের কেউ কেউ সামগ্রিক বিষয়কে অভীজ্ঞতা ও সম্ভাবনার আলোকে নিরোপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনার প্রস্তাব দিল। এ প্রস্তাব ও মতানৈক্যের ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। শান্তি বাহিনীর হাতে বেশ কয়েক জন চিন্তাশীল ও প্রভাবশালী চাকমা ব্যক্তিত্বের নৃশংসভাবে মৃত্যু ঘটলো। এদের মধ্যে আশাপূর্ণা চাকমা ও শম্ভু চাকমার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আশাপূর্ণ চাকমা ছিল একজন প্রাথমিক শিক্ষক। সে "জন-সংহতি"র একজন প্রভাব শালী নেতা ছিল। ১৯৭৩ সালেই তাকে ও তার ছোট ভাই জ্ঞান পূর্ণা চাক্‌মাকে গ্রেফতার করা হয়। জ্ঞান পূর্ণা চাক্‌মা ছিল 'শান্তি বাহিনী'র সদস্য। পরবর্তী কালে আশা-পূর্ণা চাক্‌মাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আশা পূর্ণা চাক্‌মা পূর্ণোদ্যমে "জন-সংহতি" ও 'শান্তি বাহিনী'র কাজ করতে থাকে। পরবর্তীকালে অন্যানাদের মত সেও বুঝতে পারে তাদের সমগ্র কর্মকাণ্ডের পেছনে ভারতের হাত রয়েছে। তাই আশাপূর্ণা চাক্‌মা নতুনভাবে বিষয়টির

www.pathagar.com

মূল্যায়ণ করার জন্য চাকমাদের মাঝে জন মত গঠন করতে থাকে। এ অপরাধে শান্তি বাহিনীর লোকেরা তাকে হত্যা করে। আশাপূর্ণা চাকমার মৃত্যু ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হৃদয় বিদারক। আশা পূর্ণার সাথে তার সমগ্র পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছিল তার ষাট বৎসরের বৃদ্ধ পিতা, পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা, যুবতী স্ত্রী ও তিনটি শিশু পুত্র। এদের সককেই 'শান্তি বাহিনী' লোকেরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। বাস্তব বাদী চাক্‌মা নেতাদের উপর শান্তিবাহিনীর অত্যাচারের নিষ্ঠুতা কুখ্যাত দুষ্কৃতি-কারী দল' "মাফিয়া"কেও ছাড়িয়ে যায়। তবুও চাকমা ও অন্যান্য উপজাতির মধ্যে শান্তি বাহিনীর প্রভাব কমতেই থাকে। এক পর্য্যায়ে মানবেন্দ্র লারমা ও জন সংহতির অন্যান্য নেতা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে ও শান্তি কর্ম বাহিনীর তৎপরতা শুভ লংয়ের ভারতীয় সীমান্তের নিকটে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

চাক্‌মা সমস্যা প্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বিষয়টি হোল চাক্‌মাদের বাংলাদেশের বসতি স্থাপন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাহাদের সংখ্যা ও ভূমিকা সম্পর্কে।

চাক্‌মা উপজাতি বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়। তারা আরাকান হতে চট্টগ্রামে পলায়ন করে। ১৭৮৭ সালের ২৪শে জুন তারিখে তৎ-কালীন ব্রহ্মরাজ এক পত্রে চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসন কর্তাকে পলাতক চাকমাদের ফেরৎ পাঠানোর অনুরোধ জানান (আব্দুস সাত্তার ঃ আরণ্য জনপদে, পৃঃ ৫-৬ দ্রঃ)। স্যার রিজলে ও ক্যাপ্টেন লুইনসহ কয়েক জন নৃতত্ত্ববিদ অভিমত প্রকাশ করেন যে, চাকমারা ব্রহ্মদেশ হতে বাংলাদেশে এসেছে।

চাকমাগণ নিজেরাও স্বীকার করে যে, তারা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয় এবং চম্পক নগর হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করে। এ চম্পক নগর হতেই চাক্‌মা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তারা নিজেদের বুদ্ধদেবের বংশধর বলে দাবী করে থাকে। চাক্‌মাদের ঠিকুজী সম্পর্কে তাদের দ্বারা স্বীকৃত, "রাধা-মোহন-ধনপতি" 'ও' "চাটিগা-ছাড়া" নামক উপখ্যানদ্বয়ে উপরোক্ত মতবাদ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

যাহোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চাক্‌মারা হয় ব্রহ্মদেশ থেকে বা ত্রিপুরা থেকে বড় জোর দুই শতাব্দী পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করেছে। এ প্রসঙ্গে জনাব আবদুস সাত্তার বলেন, "এই সব উপজাতি যে, এখানকার উপজাতি নয় তা আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়" ('আব্দুস সাত্তার ঃ পৃঃ ৬)। চাকমারা যেখান থেকেই আসুক, গত দুই শত বৎসর যাবৎ তারা এদেশের নাগরিকরূপে নিজেদের গড়ে তোলারই চেষ্টা করেছে। এদেশের মানুষের সাথে মিলে মিশে জীবন যাপন করেছে। এমনকি বাংগালীর সাহায্যে তারা তদের মাতৃভূমি আরাকান আক্রমন ও লুন্ঠন করেছে। (দঙ্গাওয়াদি আরেদফং, প্রঃ)।

চাকমারা এদেশের সাথে পুরাপুরি মিশে যাওয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কয়েজন রাজার নাম করণের মাধ্যমে। চাকমাদের কয়েকজন রাজার মুসলমানী নাম পাওয়া যায়। শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষের মতে, ১৭১৫ সাল হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত জামুল খাঁ, সেরমুস্ত খাঁ, সের দৌলত খাঁ, জান বক্স খাঁ, জব্বার খান প্রভৃতি চাকমা রাজারা রাজত্ব করেন (সতীশ চন্দ্র ঘোষ ঃ চাকমা জাতি পৃঃ ৫)। আবার চাকমাদের কয়েকজন হিন্দু রাজাও পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রাজা শুকদের রায়, রাণী-কালিন্দী প্রমুখ বিখ্যাত। মোটকথা চাকমা উপজাতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম প্রভাব পরিবর্তনের সাথে নিজেদেরও পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে চাকমাগণ নিজেদের বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরূপে দাবী করে থাকে। সামগ্রিক অবস্থা বিশেলষণ করে এটা স্পষ্ট হয় যে, চাকমাগণ বাংগালী জাতি সত্বার মাঝেই বিকসিত হয়েছে। তাদের পৃথক জাতীয় সত্বার কোন লক্ষণই কখনো দেখা যায় নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে চকমা উপজাতি নিরঙ্কুস সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়।

১৯৮১ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামে বাসকারী উপজাতিদের গৃহ শুমারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র উপজাতিসমূহের মধ্যেও চাক্‌মাগণ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ নয়। নিম্নে তথ্য হতে বিষয়টি পরিস্কার হবে ঃ

www.pathagar.com

উপজাতির নাম	গৃহ সংখ্যা	হার
চাক্মা	৩৯০০৫	৪৮'১২
মারমা	২২৫২০	২৭'৭৪
ত্রিপুরা	৯৯৭৭	১২'৩১
ত্যাং চাংগা	৩২৪৭	৪'০১
মুরাং	৩২৬৮	৪'০৩
উচি	৭৩৬	০'৯১
লুসি	১৯১	০'২৪
বনু	১০৫২	১'৩২
পাংখো	৪১৮	০'৫২
চাক	১৬৭	০'৭১
কিয়াং	২৬১	০'২৭
খুমি	২১৮	০'২৫

(B. B. S. census—1981, Statistical year book 81. P—84)।

উপরিউক্ত তথ্যে ইহা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাসকারী উপজাতিসমূহের শতকরা ৪৮'১২ ভাগ চাকমা। উক্ত জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বাংলা ভাষী। সুতরাং মোট জনসংখ্যার মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা শতকরা ৩৬/৩৭ ভাগ হবে। এই সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনতা কিভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে কথা বলতে পারে? প্রশ্নটি পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতিসমূহের মনেও উদিত হয়েছে। অবশ্য বিদেশী রাষ্ট্রের এজেন্টদের নেতৃত্বে গঠিত শান্তি বাহিনীর উগ্রপন্থী অংশ এসব প্রশ্নের উত্তর অস্ত্রের মাধ্যমেই দিচ্ছে। তারা শুধুমাত্র বাংলাভাষীদের উপরই নয়, পার্বত্য চট্রগ্রামের অন্যান্য উপজাতিসমূহের উপরেও সমানে অস্ত্র ব্যবহার করছে। তাদের এক অংশ চাঁদা আদায়ের নামে ধনী চাকমাদের উপরও নির্যাতন চালাচ্ছে। ফলে বর্তমানে "শান্তি বাহিনী" মোটামুটি ডাকাত বাহিনীরূপে উপজাতিসমূহের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। আমরা আগেই বলেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সব উপজাতি বহু পূর্বেই শান্তি বাহিনীর সাথে সম্পর্কচেছদ করেছে এবং ইদানীং কালে চাকমাদের বিরোধিতা করছে। ইতিমধ্যে শান্তি বাহিনীর বহু সশস্ত্র

www.pathagar.com

সদস্য অস্ত্র সহ সরকারের নিকট আত্ম সমর্পণ করেছে। কারণ এখন উপজাতী সমূহকে একটি সশস্ত্র সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করে দেওয়ার বিদেশী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উপজাতীয় জনগণ সজাগ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সরকারও উপজাতি সমূহের ন্যায় সঙ্গত সমস্যা সমাধানে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে বান্দর বন মহকুমাকে জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বান্দরবন জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরো প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য পৃথক বোর্ড গঠণ করা হয়েছে।

আমাদের সকলকে উপজাতীয়দের সমস্যা সহৃদয়তার সাথে অনুভব করতে হবে। উপজাতীয় জনগণের আর্থিক ও মানষিক সংকট লাঘবে আমদের সাধ্যানুযায়ী যত্নবান হতে হবে।

যা-হোক, এটা অনস্বীকার্য যে চাক্মা উপজাতির বিষয়টি একটি জাতীয় সমস্যার পর্য্যায়ে পড়ে না এবং এসমস্যার মাধ্যমে কেউ কোন অবৈধ সুবিধা যে আদায় করতে পারবে না তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর সাম্প্রতিক পরিবর্তন

আমাদের সামাজিক কাঠামোয় সাম্প্রতিক কালে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশ হতে খুব দ্রুত একাধিক পত্নী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানীগণ মনে করেন কৃষি ভিত্তিক সমাজে বহু পত্নী প্রথা বেশী প্রচলিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে পূর্বে বহু পত্নী প্রথা রীতিমত সম্মানের চোখে দেখা হতো। স্বাধীনতার পর এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটছে। অধুনা একই সাথে একাধিক পত্নী রাখাকে বিশেষ সম্মানের

www.pathagar.com

চোখে দেখা হয় না। অর্থনৈতিক কারনেও একাধিক-পত্নী প্রথা ভেঙ্গে পড়ছে। মেয়েদের গৃহের বাইরে কর্মের সুযোগ বাড়ছে। বিভিন্ন মিল কারখানা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, সরকারী কার্যালয়, কুটির শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে অধিকতর হারে মেয়েরা সুযোগ পাচ্ছে। আজকাল প্রচুর মহিলা চিকীৎসক ও আইন জীবির পেশা গ্রহণ করছে। নানাভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কল্পে আন্দোলন চালানো হচ্ছে। পর্দার কড়াকড়ি কমছে। মুসলিম মেয়েরা প্রচুর সংখ্যায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করছে। গ্রামেও প্রচুর মুসলিম মেয়ে স্কুলে পড়ালেখা করে থাকে। এদের অধিকাংশই উচ্চ বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা লাভ করে থাকে। ফলে পর্দার প্রতি সনাতনী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে। এর ফলে গ্রামীন মেয়েদের মনে মর্যাদাবোধ ও অভাব সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা, স্বপ্ন ও বাস্তব জীবনের মারাত্মক তারতম্যের কারণে মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাল্য বিবাহ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সাধারণ ভাবে বিলম্বে বিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নের চিত্র হতে এ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে ঃ—অবিবাহিতের হার (পুরুষ)

বয়স ১৯৫১ সাল	১৯৮১ সাল
১০—১৪—৯৭·৯%	৯৯·৯%
১৫—১৯—৮৩·৯%	৯৭·১%

অবিবাহিতার হার (নারী)

১০—১৪—৭৩·৭%	৯৭·৩%
১৫—১৯—১১·৩%	৪২·৬%

(E. Pak. census Report, 1951 & stastictical year book—1981, P—63)

উপরোক্ত সংখ্যা তথ্যে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশে সাধারণভাবে অল্প বয়সে বিয়ের হার কমেছে। এক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের হার অনেক বেশী। ১৯৫১ সালে ১৫—১৯ বছর বয়সী মেয়েদের শতকরা ১১·৩ জন অবিবাহিতা ছিল। ১৯৮১ সালে এ সংখ্যা শতকরা ৪২·৬% ভাগে দাড়িয়েছে।

www.pathagar.com

শহরে ও গ্রামীন উভয় সমাজে অবিবাহিতা মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে। যৌন মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে। তালাকের হার বাড়ছে পারিবারিক স্থিথিশীলতা নষ্ট হচ্ছে।

যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। সম্পত্তির মালিকানা মোতাবেক পরিবারের প্রকার ভেদ বুঝানো হয়। এ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশে যৌথ পরিবার ভাংছে না। কারণ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পিতার বর্তমানে অন্য কেহ সম্পত্তির মালিক হয় না। তবুও যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবার দ্রুত লয় পাচ্ছে। বিবাহিত বয়স্ক সন্তানগণ প্রায়ই পিতার সংসার হতে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সম্পত্তির মালিকানার দিক দিয়ে যৌথ হলেও চারিত্রিক দিক দিয়ে একক ও ক্ষুদ্র পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে।

পরিবারের দায়িত্বও কমে যাচ্ছে। পুর্বে সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ ও চিত্ত বিনোদনের সার্বিক দায়িত্ব পরিবারই পালন করতো। অধুনা শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের দায়িত্ব পরিবার পালন করছেনা বললেই হয়। তবে বিবাহের দায়িত্ব এখনো পরিবার পালন করে থাকে। শহুরে সমাজে বিবাহের ব্যাপারে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীন সমাজেও এ বিষয়ে ছেলেদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয়। সীমিত হলেও মেয়েদের মতামতও লওয়া হয়। ব্যক্তি জীবনের উপর পরিবারের প্রভাব কমে যাচ্ছে। পুর্বে ব্যক্তির প্রত্যেক বিষয়ে পরিবারের সিদ্ধান্ত যেমন কার্যকর ছিল, বর্তমানে তেমন নেই।

গ্রামীন অভিজাত শ্রেণীর কাঠামো, চরিত্র ও প্রভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৫৮ সালের পুর্বে পারিবারীক মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা ও বয়সের ভিত্তিতে গ্রাম্য অভিজাত শ্রেণী গঠিত হত। গ্রাম্য মাতবর শ্রেণী পরিবারিক মর্যাদার ভিত্তিতে উৎপত্তি লাভ করতো। বর্তমানে এ অবস্থার বেশ পরিবর্তন হচ্ছে। মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যদের অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে 'ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামের' নামে প্রচুর নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারনেও তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর ফলে গ্রামে নতুন ধনী ও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছে। সনাতনী সালিশী পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের বিচার শালিসের স্থান গ্রহণ করেছে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী পরিবার সমূহের প্রভাব কমে গেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে লক্ষ লক্ষ বাংগালী তরুণ অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। এদের দাপটে সনাতনী অভিজাত শ্রেণীর অবস্থা আরো সঙ্গীণ হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতার পর যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও কৃষিতে সেচ ব্যবস্থায় বেশ উন্নতি হয়েছে। এর ফলে গ্রামীন বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রায় অবসান ঘটেছে। গ্রামে রিক্সা চালক শ্রেণী গড়ে উঠেছে। তাছাড়া চাউলকল, কাঠের করাত, ক্ষুদে মৎস্য খামার ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠছে। ফলে গ্রামীন জীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্থবিরতা অতি ধীরে কেটে যাচ্ছে। শহর এলাকায় নতুন নতুন কর্মের সুযোগ বাড়ায় প্রায় গ্রামেই নগদ অর্থ আয়কারী শ্রমিক পরিবারের উৎপত্তি হচ্ছে। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষকগণ গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মেরুদণ্ড রূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। তারা মাস শেষে নিয়মিতভাবে নগদ অর্থ পেয়ে থাকে। মূলত তারা চাষী পরিবার। সুতরাং নগদ অর্থ তাদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বেশ সহায়ক হচ্ছে। মনে হয় শিক্ষিত নিম্ন বেতন ভোগী পেশা জীবিদের মধ্যে প্রাথেমিক শিক্ষকগণ একমাত্র শ্রেণী যাদের জীবন মানের সামান্য হলেও উন্নতি ঘটেছে। তার কারণ হোল, প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবনের চাহিদা কম ও তারা কায়িক শ্রমে বিমুখ নয়। গ্রাম্য সনাতন মহাজন শ্রেণী প্রায় অবলুপ্তির পথে। তার দু'টি কারণ। প্রথমতঃ ব্যাংকের কার্যক্রম গ্রাম পর্য্যায়ে সম্প্রাসারিত হওয়ায় গ্রামীন চাষীরা মহাজনের দ্বারস্থ হতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ মহাজনদের অধিকাংশ হিন্দু হওয়ায় তারা তাদের মূলধনের উপর দায়িত্ব নিতে চায়না। তবে মধ্যপ্রাচ্যে গমন কারী গ্রামীন শ্রমিকগণ নতুন মহাজন রূপে আত্ম প্রকাশ করছে। এদের হাতে প্রভুত নগদ অর্থ আসায় গ্রামীন অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এরা জমিতে বেশী অর্থ লগ্নি করছে, সেহেতু জমির দাম খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ফসলের মূল্য বৃদ্ধিও জমির মূল্য বৃদ্ধির আর একটি কারণ।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর অবাঙ্গালীদের অনেক ছোটখাট ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংগালীরা ক্রয় করেছে। এই সব ছোট প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ নব্য উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী রূপে আত্ম প্রকাশ করছে। তাছাড়া বৃহৎ শিল্প সমূহ জাতীয় করণের ফলে এক শ্রেণীর আমলার হাতে প্রচুর অর্থ আসে। ব্যবসায়ী ও ক্ষুদে শিল্প পতিগণ জাতীয় করণ নীতির আওতার বাইরে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করছে। এ পুজি প্রধাণতঃ যান বাহন খাতে বিনিয়োগ করা হয়। স্বাধীনতার পর হঠাৎ করে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যাওয়ায় মানুষের চলা চল অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। রেলওয়ে ও ষ্টীমারে চরম বিশৃংখলার কারণে এবং সড়ক পথের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ফলে সড়ক পরিবহন লাভ জনক ব্যবসা হয়ে ওঠে। ফলে নব্য বাঙ্গালী পুঁজিপতিগণ পরিবহন খাতে তাদের পুজির বেশীর ভাগ বিনিয়োগ করে। ছোট ও বড় আকারের জলজান তৈরীর কারখানা গড় উঠেছে। এই খাতেও বাংগালীরা পুজি বিনিয়োগ করছে।

উঠতি পুজিপতি ও আমলাদের হাতে নগদ অর্থ আসায় শহরে বাস্ গৃহ তৈরীর হিড়িক পড়ে গেছে। এখাতে বিনিয়োগ লাভ জনক ও নিরাপদ। দেখতে দেখতে বহু গৃহ নির্মাণ সমিতি জন্ম লাভ করেছে। এ ব্যবসায়ে বেশ কিছু লোক মোটা-মুটি ধনী হয়েছে।

বিদেশে জন শক্তি প্রেরণের হিড়িক পড়ে গেছে। মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যে শ্রমিক প্রেরণের জন্য অনেক গুলি সংস্থার জন্ম হয়েছে। এ খাতেও অনেকে ধনী হয়েছে।

উৎপাদনে আধুনিক যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে বর্ণ প্রথা ভিত্তিক গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। কামার, কুমার, স্বর্ণকার, তাঁতী ইত্যাদি বর্ণ প্রথা ভিত্তিক পেষা জীবি শ্রেণী তাদের পেষা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া যেসব পেশা এককালে শুধু মাত্র নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের এক চেটিয়া ছিল, সেসব পেশায় মুসলমানগণ প্রবেশ করছে। ট্রলার ও মৎস্য খামারের মাধ্যমে মুসলমানগণ মৎস্য ব্যবসায়ে প্রবেশ করছে। নাপিত ও ধোপার মত পেশাও মুসলমানগণ ধীরে ধীরে গ্রহণ করছে।

www.pathagar.com

শহরে লোক সংখ্যা বাড়ছে। শহরে জীবনের সুযোগ সুবিধা গ্রামের দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। যেমন পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড অনেক অজ পাড়া গাঁয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। মানুষের অভাব সচেতনতা (Want-consciousness) বেড়ে যাওয়ার ফলে গ্রাম হতে অধিক হারে জনতা শহরে ভীড় করছে। বাংলাদেশের শহরগুলিতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির গতি ও হার নিম্নরূপ ঃ—

শহরে লোকের হার

সাল—	১৮৯১	১৯৪১	১৯৭৪	১৯৮১
মোট জনসংখ্যার হার—	২.১৮%	৩.৩৮%	৮.৭৮%	১০.৬৪%

(B. B. S. year book 1981-P-53)

উপরোক্ত সংখ্যা তথ্যে দেখা যায় যে, ১৮৯১ সাল হতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ৫০ বছরে শহরে জন সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১.২০% ভাগ, আর ১৯৪১ সাল হতে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ৩৩ বছরে বেড়েছে ৫.৪০% ভাগ, কিন্তু পরবর্তী মাত্র ৭ বছরে এ বৃদ্ধির হার ১.৪৬% ভাগ। এতেই বুঝা যায় যে, আমাদের দেশে শহুরে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্তত বৃদ্ধির হার ও গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দেশে সাক্ষর ও শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু নিরক্ষরের হার বেড়ে যাচ্ছে। তার কারণ, জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারের সাথে সাক্ষরতার হার বাড়ছে না। এ অবস্থা কিছুতে চলতে দেওয়া উচিৎ নয়।

স্বাধীনতার পর মুসলিম যুবকদের মাঝে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। মসজিদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে ও তাতে নামাজীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'ইসলাম পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ যন্ত্রের রক্ষার মাধ্যম', এ মনোভাব বর্তমানে না থাকায় ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সমর্থকদের সাথে ভারতের নৈকট্যের সন্দেহের কারণে ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়েছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতই ধর্ম ভীরু। তারা ১৯৭১ সালে ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তবে সাম্প্রতিক কালে ধর্মীয় মূল্যবোধের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা আগেই বলেছি পর্দা প্রথা ভেঙ্গে পড়েছে। তাছাড়া বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনাও

www.pathagar.com

বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মাদ্রাসার ছাত্ররা জীবিকাশ্রয়ী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সামান্য হলেও মাদ্রাসায় ইংরেজী-বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি আধুনিক বিষয় পাড়ানো হচ্ছে। মৌলভী সাহেবদের মধ্যে মিলাদ পড়ে, তাবিজ বিক্রী করে ও ওয়াজ করে জীবিকা নির্বাহের প্রবনতা কমছে।

রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে, যাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা বলে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতার পরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর আবার ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি শুরু হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সর্বপ্রথম খোন্দকার মোশতাক আহমাদ টেলিভিশন ও বেতার মারফৎ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে "বিছমিল্লা" ও "সালাম" ব্যবহার করেন। তার পর থেকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক বাংলাদেশের সব রাষ্ট্র প্রধানকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে "বিছমিল্লা" ও 'সালাম' ব্যবহার করতে হচ্ছে। এতেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে সাধারণ দেশবাসীর ধর্মীয় মূল্য বোধের প্রভাব অনুধাবণ করা যায়।

নানামহলের উৎসাহে ১৯৭৫ সালের পর ব্যাঙের ছাতার ন্যায় অনেকগুলি রাজনৈতিক দল জন্ম লাভ করেছে। এদের সংখ্যা ৭০টি হবে। স্বাধীনতার পর আমাদের রাজনীতির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হলো জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের প্রভাব হ্রাস ও পেশাজীবিদের প্রভাব বৃদ্ধি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের পেশা জীবি সংগঠগগুলি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করেছে। এসব আন্দোলনের মধ্যে বেসরকারী কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনব্যাপী ধর্মঘট, নন গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের দীর্ঘদিন ব্যাপী ধর্মঘট, ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট ও প্রাথমিক শিক্ষকদের ৭৫ দিন ব্যাপী ধর্মঘট ও মহাবিক্ষোভ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনে দেশের সকল ডান, মধ্যম ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সম্পৃক্ত হয়েছিল। উপরোক্ত আন্দোলনগুলি আমাদের রাজনৈতিক ধারার পরিবর্তনের ইংগিত বহণ

www.pathagar.com

করে। এখানে উল্লেখ্য যে, পেশা জীবিদের আন্দোলনে পূর্বের ন্যায় বাম পন্থীদের নেতৃত্ব ছিল না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বর্তমানে মোটামুটি তিনটি প্রধান ধারা দেখা যায়। যথা: ১। বামপন্থী ২। ইসলাম ও ৩। মধ্যপন্থী। এক কালের মধ্যপন্থী ও সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ভারত-মস্কোপন্থী বলে পরিচিত রাজনৈতিক শক্তির একটি মোর্চা গঠিত হচ্ছে। আবার ভারত-মস্কো বিরোধী আর একটি বাম পন্থী শিবিরও রয়েছে। খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সংসদীয় গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী একটি মোর্চা গঠিত হচ্ছে। বি, এন, পি, জাতীয়লীগের একাংশ এবং মুসলিম লীগের কয়েকটি উপদল ও মধ্যম পন্থী বলে পরিচিত। এরা এখনও উক্ত মোর্চায় যোগদান করে নি। জামাতে ইসলামের প্রধান নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে ইসলাম পন্থিদের মেরুকরণ হচ্ছে।

১৯৮১ সালের অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ ইসলামের নামে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। সাম্প্রতি মস্কো পন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সহ ধর্ম নিরেপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী জোট মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ্‌র সাথে সাক্ষাত, দোয়া-কামনা ও আহার গ্রহণের ফলে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে আরো অনেক পরিবর্তন ঘটবে এবং আমাদের রাজনৈতিক কাঠামোর স্থায়ী রূপ গ্রহণ করতে আরো সময় লাগবে।

বাংলাদেশের অপরাধের প্রকৃতিতে বেশ পরিবর্তন এসেছে। সিঁদেল চুরি কমেছে, কিন্তু সশস্ত্র ডাকাতি বেড়েছে। নানা প্রকারের প্রতারণার হার বেড়েছে। এর মধ্যে বিদেশে চাকুরি সংস্থান ও গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রতারণাই বেশী। এ দুটো আমাদের দেশে স্বাধীনতার পূর্বে অপরিচিত ছিল। যৌন অপরাধ বেড়েছে। দেহ পশারনীরা বেশ্যালয়ের বাইরে এসে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ছদ্মবেশে বাস করছে।

www.pathagar.com

পার্কে স্টেশনে ও অন্যান্য স্থানে দেহ পশারণীগণ প্রকাশ্যে ঘুরছে। স্বাধীনতার পূর্বে এটাও অপরিচিত ছিল।

ব্যক্তি জীবনের উপর পরিবারের বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে, তরুণদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আসার ফলে ও দারিদ্রের কারণে কিশোর অপরাধ বেড়েছে। কিশোর অপরাধীদের বেশীর ভাগ দরিদ্র। কিছু সংখ্যক কিশোর অপরাধী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সন্তান। কিশোরদের মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। হিন্দুদের মন হতে পলায়নী মনোভাব দূরীভূত হয়ে আস্থার ভাব সৃষ্টি হচ্ছে। হিন্দুদের দেশ ত্যাগ বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রদায়িক সম্প্রতি আমাদের সামাজিক কাঠামোর স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির জন্য বেশ সহায়ক হয়েছে।

কোন জরীপ না হওয়া সত্ত্বেও বলা যায়, আমাদের সামাজিক জীবনে অতিক্ষীণ হলেও ইতিবাচক গতি সঞ্চারিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশবাসী সরকারের নিকট অতিবেশী প্রত্যাশা করে ছিল কিন্তু সব কয়টি সরকার তাদের হতাশ করেছে। তাই আবার বাংগালী জাতি তার পূর্বের ঐতিহ্যে ফিরে গেছে। তারা উপলব্ধি করেছে তাদের জন্য কেউ কিছু করবে না। তাই নিজেদেরই করতে হবে।

ঢাকা জেলায় লোহার খনি

জেম্‌স্ ওয়াইজ ছিলেন ইংরেজ চিকিৎসক। তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে বেশ কয়েক বৎসর ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি "Races, castes and Trades of Eastern Bengal" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে লণ্ডন হতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক হ্যারিসন এণ্ড. সনস্। এই গ্রন্থটির একটিমাত্র ফটো কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে "দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ" শাখায় সংরক্ষিত আছে। আমি আমার

www.pathagar.com

বর্তমানে গ্রন্থের খনিজ সম্পদ সম্পর্কিত অধ্যায় ছাপা হয়ে যাওয়ার পর জন সম্পদ সম্পর্কে পড়তে গিয়ে একটি আশ্চার্য বিষয় জানতে পারি। ঢাকা জেলার প্রধান সম্পদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জেমস্ ওয়াইজ লিখেছেন যে, ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চল উৎকৃষ্ট লোহা সম্পদে সমৃদ্ধ। তিনি লিখেছেন, "………are rich in Iron Ore" (বর্ণিত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃঃ-IV)।

বিষয়টি আমার মনকে আকৃষ্ট করল। আমি সংশ্লিষ্ট মহলে কয়েকজনের সাথে আলোচনা করলাম। কিন্তু কেউই ইংরেজ লেখকের বর্ণিত লোহার খনি সম্পর্কে কিছু বলতে পারলেন না। অবশেষে আমি প্রাথমিক শিক্ষকদের সাহায্য গ্রহণ করি। প্রাথমিক শিক্ষকদের মাধ্যমে এক আশ্চার্যজনক খবর পাওয়া গেল। ঢাকা জেলার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কাপাসিয়া থানা। উক্ত থানায় লোহাদি নামক একটি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামে লোহার খনি আছে। মাটির উপরে উক্ত লোহার একাংশ বের হয়ে এসেছে। পাকিস্তান আমলে হেলিকপ্টার যোগে কিছু দেশী বিদেশী লোক উক্ত খনি দর্শন করতে গিয়ে ছিলেন। স্বাধীনতার পর হতে কেহই উক্ত খনির কোন খোঁজ খবর নেয়নি। হায়রে আমার দূর্ভাগা দেশ! এক শতাব্দী পূর্বে বিদেশীরা যে সম্পদের খবর রাখত আজো আমরা তার খবর রাখিনা।

www.pathagar.com

তবু কেন এত দারিদ্র !

আমাদের এত বিপুল খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ, পানি সম্পদ, ও মানব থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা এত দরিদ্র? বিশ্ব সমাজে বাংলাদেশ তৃতীয় দরিদ্রতম দেশ। ভুটান ও কম্পুচিয়ার পরেই দারিদ্রের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান। কেন এত দারিদ্র? কেন এত হতাশা? ১৯৭৯ সালে আমি এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, বিশিষ্ট ছাত্র নেতা ও নাগরিকদের এক সমাবেশে মরহুম রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান আমাকে এ প্রশ্ন করে, "সাহসী সৈনিকের মত" উত্তর দানের অহবান জানিয়ে ছিলেন। আমি আমার স্বভাবেই জওয়াব দিয়েছিলাম।

এ প্রশ্নে আমার জবাব হোল, আমাদের সকল দারিদ্র ও দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণীর অযোগ্যতা ও সীমাহীন লালসা। জনগণের কারণে বাংলাদেশ কখনো দুর্যোগে পতিত হয়নি। সাধারণভাবে অভিজাত শ্রেণীর, বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যার্থতার কারণেই যুগে যুগে সমাজে দুর্যোগ নেমে এসেছে। আবার রাজনৈতিক নেতৃত্বেই সমাজ দুর্যোগ মুক্ত হয়েছে। উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে! নেতৃত্বের কারণে সমাজে যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম আযম একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর চিত্র একেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ—

"১। সমাজের অসৎ নেতা, কর্তা, ধনী ও প্রভাবশালীদের মন্দ চরিত্রের কারণেই সমাজে এত খারাবী, চালু আছে।

২। তাদের অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও জুলুমের ফলেই সমাজে এত অশান্তি ও দুঃখ দেখা যায়।" (অধ্যাপক গোলাম আযম ঃ আম পারার তপসীর, পৃঃ ১৯)।

বাংলাদেশের দুর্দশার মূল কারণ হোল নেতৃত্বের ব্যার্থতা। ইংরেজ আমল হতে এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ও আমলাদের চরিত্র হননের

www.pathagar.com

সুসংগঠিত কার্যাক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে জাতীয় চরিত্র হানির কার্যাক্রম বন্ধত হয়ই নি, বরং ইহা সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানী আমলের শেষে দিকে জাতীয় চরিত্র হননেব কার্য্যক্রমকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে অনুপ্রবেশ করানো হয়। স্বাধীনতার পর আশা করা গিয়েছিল, এবার জাতীয় চরিত্র গঠণের জন্য একটি বাস্তব ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে তার বিপরীত। স্বাধীনতার পর যুব চরিত্র হননের মহোৎসব পড়ে গেল। সমাজের সর্বত্রই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকাশ্য মহড়া চললো। নকলের হিড়িক সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল। ১৯৭৫ সালের পর যুব কমপ্লেক্স, গ্রাম সরকার ইত্যাদি গঠণ করে আইউবের মৌলিক গণতন্ত্রী কায়দায় গ্রাম্য অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র হনন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মোট কথা, স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে কোন সরকারই জাতীয় চরিত্র গঠণের বাস্তব ও কাঠা'র কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। ফলে একটি দেশ প্রেমিক-চরিত্রবান যুব শ্রেণীর পরিবর্তে অস্ত্র ও বাহুবল নির্ভর সাধারণ বুদ্ধিমত্তার যুবকেরা রাজনৈতিক অঙ্গনে ভয়ানক ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রাজনীতিতে বাস্তব ও যৌক্তিক বক্তব্যকে স্তব্ধ করার জন্য অস্ত্রের ব্যবহার অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

১৯৭২ সালে পূর্বাপর প্রতিক্রিয়া বিবেচনা না করে, দেশের সকল পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রীয় করণ করা হয়। এর ফলে একদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিভা ও উদ্যোগ নিরুৎসাহী হয়ে পড়ল। অপর দিকে যুদ্ধ বিক্ষত একটি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী সহযোগিতা মূলক উদ্যোগের যে প্রয়োজন ছিল, তার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। অথচ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালের পর অবাধে বিদেশী পুঁজি ও কারীগরী জ্ঞানের সাহায্যে নিজস্ব অর্থনীতির মৌল কাঠামোর ভিত্তি শক্তিশালী করে তুলেছিল। আমরা অন্তত এ উদাহরনটি অনুসরণ করতে পারতাম। অথচ তথাকথিত তন্ত্র মন্ত্রের নামে আমাদের অর্থনীতিতে এমন লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা সৃষ্টি করা হোল যে, অতি সহজেই বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের অবাধ বাজারে পরিণত হোল। পাকিস্তানী আমলে ভারতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

www.pathagar.com

করেই আমরা বিশ্ব পাট বাজারে একচেটিয়া আধিপাত্য বিস্তার করেছিলাম। অথচ স্বাধীনতার পরে আমাদেরই পাট চোরাই পথে ক্রয় করে ভারত বিশ্ব পাট বাজারে আধিপাত্য বিস্তার করেও "পাট রাণী" রজনী পালন করে। তবুও আমাদের সরকার ভারতের নেতৃত্বে 'জুট-ইন্টার ন্যাশনাল' গঠনের পক্ষে জোর গলা বাজী করেছে। অবশেষে বাংলাদেশের জন্য চরম আত্মঘাতী 'জুট ইনটার ন্যাশনাল' গঠিত হয়েছে। সকল বিবেচনায় এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশ, ভারতের সাথে প্রতিদন্দ্বিতা মূলক অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসাবে বাঁচতে পারে। সম্পূরক অর্থনীতি আমাদের অনিবার্য্য ধ্বংস ডেকে আনবে। তবুও বাংলাদেশকে সম্পূরক অর্থনীতি অনুসরণ করতে হচ্ছে। যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হয়েছে।

আমাদের রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী "প্রেসার গ্রুপ" আছে! এই চাপ সৃষ্টিকারী মহলটি স্বাধীন বাংলাদেশের সকল সরকারের উপর অব্যাহত ভাবে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। যে মহলই ক্ষমতায় এসেছে চাপের মুখে ভারতকে অর্থনৈতিক সুবিধা দান করতে বাধ্য হয়েছে। ক্ষমতাসীন মহলের মূল লক্ষ্য থাকে যে কোন ভাবে হোক ক্ষমতায় টিকে থাকা। তজ্জন্য শিল্প, শিক্ষা, কৃষি সর্বক্ষেত্রে সস্তা হাত-তালির রাজনীতি প্রচলিত হয়ে গেছে। ফক্কা বাজীর রাজনীতি হতে কিছুতেই আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। আমাদের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য হয়ে পড়ে, যাতে ক্ষমতাসীন দলের বাহিরে অর্থ না যেতে পারে। যাতে দেশীয় ধনীদের সাহায্যে কোন বিরোধী দল গড়ে উঠতে না পারে। ফলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো বিদেশী সাহায্য নির্ভর হয়ে পড়ে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের সব কয়টি সরকার জাতীয় মূল্য বোধ ও বাস্তবতা বিবেচনা না করে সস্তা রাজনৈতিক জন প্রিয়তার উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে-এ যাবত কোন উন্নতি না হয়ে, সমস্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রে আমরা বাস্তব ও ভারসাম্য-সম্বলিত কোন নীতি প্রণয়ণ করতে পারিনি। ১৯৭৪ সালের পূর্বে ও পরে কৃষি উন্নয়ন প্রজেকট্ প্রনয়নে বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে—, এ সম্পর্কে অজ্ঞ রাজনৈতিক

www.pathagar.com

কর্মিদের উপর বেশী নির্ভর করা হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মিদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য—সেচ পরিকল্পনার গম বিতরণ করা হয়েছে অবাধে।

ইতিহাসের সেই আদি কাল থেকে বাংলাদেশ বেহিসাবী সম্পদ পাচার হয়েছে। মুসলিম, ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ ছিল শোষণের স্বর্ণক্ষেত্র। স্বাধীনতার পরে আশা করা গিয়েছিল এ অবস্থার অবসান হবে। কিন্তু ভারতীয় সেনা বাহিনীর লুন্ঠণ বাংলাদেশকে শোষণের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। নিরুপায় বাংগালী জাতি অসহায় ভাবে বন্ধু বেশী সেনাদের অবাধ লুন্ঠণ ও সম্পদের পাচার অবলোকন করে। পরবর্তী কালে আরো সুকৌশলে বাংলাদেশের সম্পদ পাচার অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতার পর মাত্র ১০ বছরে যত সম্পদ পাচার হয়েছে, বিগত ৩০ বছরেও এত সম্পদের পাচার হয়নি বলে মনে হয়.। নকল কাগুজে নোট, মাদক দ্রব্য ইত্যাদি এ পাচার প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলে বাংলাদেশের টাকার মূল্য কিছুতেই স্থিতিশীল হতে পারে না।

আমাদের অফুরন্ত খনিজ সম্পদ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। অতীতে বিদেশী সরকারগুলো বাংলাদেশকে দুর্বল রাখার জন্য বাংলাদেশের খনিজ সম্পদকে গোপন রাখত। উন্নয়ণে বাধা দিতো। স্বাধীনতার পর বাধা আরো জোরদার ও প্রকট হয়েছে। তবে কৌশলটি পৃথক। ১৯৭৫ সালের পূর্বেকার সরকার খুব উৎসাহের সাথে উপকুলীয় অঞ্চলে তৈলানুসন্ধানের জন্য কয়েকটি বিদেশী কোম্পানীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তৈলানুসন্ধানী কোম্পানীগুলি পাত তাড়ি গুটিয়ে ফেললো। কারণ কি? গুজব ছড়ানো হলো বাংলাদেশের উপকুলে তৈল নেই। কিন্তু যন্ত্রপাতী স্থাপনের পূর্বেই কি করে জানা গেল যে, উপকুলে তৈল নেই? ঘটনাটি রহস্যজনকই রয়ে গেছে। জনশ্রুতিতে জানা গেছে যে, তৎকালীন সরকার এক প্রকার চাপ দিয়েই বিদেশী তৈলানুসন্ধানী কোম্পানীগুলোকে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশ সরকার নাকি বিদেশী কোম্পানী সমূহের কর্মচারীদের নিকট, তাদের বেতনের শতকরা ষাটভাগ আয়কর হিসাবে দাবী করেছিল। চুক্তিতে এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। বাংলাদেশ—

সরকার তার দাবীতে অটল থাকল। সকল বিদেশী কোম্পানীগুলো বিস্মিত হলো, ক্ষুব্ধ হালা দুঃখীত হলো। বাংলাদেশ ছেড়ে তাদের চলে যেতে হলো। বোনাস বাবদ বাংলাদেশ সরকারকে দেয় কয়েকশত কোটি টাকা ও যন্ত্রপাতী আনয়ণ, কর্মচারী নিয়োগ বাবদ বিপুল অর্থ লোকসান হলো। জানিনা, উপরোক্ত তথ্য কতটুকু সঠিক। তবে এটা ঠিক যে, বাংলাদেশে তৈলানুসন্ধান ও উন্নয়ণের ব্যাপারে বিদেশী কোম্পানীগুলি নিদারুণভাবে ক্ষতি গ্রস্থ ও আস্থাহীন হয়েছে।

কোন ব্যাক্তি বা জাতি কাউকে বিনা স্বার্থে সাহায্য করে না। সুতরাং তৈলানুসন্ধান ও উন্নয়নে কেহই নিঃস্বার্থে সাহায্য করবে না। তবে এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থ আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি আমাদের সম্পদের উন্নয়ণের মাধ্যমে জাতীয় দরিদ্র দূর না করি, তবে দারিদ্রের কারণে জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে ও আমরা আমাদের সম্পদের মালিক থাকবো না।

আমাদের খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও উন্নয়নের ব্যাপারে কতিপয় শক্তিশালী ব্যক্তির একটি মাত্র কথাই যথেষ্ট, "অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়।" যারা এ মোক্ষ বাক্যটির মাধ্যমে আমাদের খনিজ সম্পদকে মাটির চাপা দিয়ে রাখছে, তারা দেশী বিদেশী বহু মহলের সাহায্য সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্য পেয়ে থাকে। এভাবে আমাদের প্রচুর মূল্যবান সম্পদ মাটি চাপা পড়ে আছে। অথচ যেটুকু সম্পদকে কিছুতেই লুকিয়ে রাখা যায়নি, যেমন গ্যাস, তা ভারতের নিকট বিক্রী করার জন্য উক্ত মহলটির উৎসাহের কোন অভাব নেই। যুক্তি একটাই।

স্বাধীনতার পর চোরা কারবারী সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের সন্তানরা আরবের মরুভূমি ও ইউরোপের বরফ শীতল আবহাওয়ায় রক্ত পানি করে যে বৈদেশিক মূদ্রা আয় করে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এক শ্রেণীর চোরাকারবারী উক্ত অর্থ চোরাচালানে ব্যবহার করছে। ঘড়ি, ইলেক্‌ট্রোনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দ্রব্য বাংগালী-দের উপার্জিত অর্থে ক্রয় করা হয় ও ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে আনয়ন করে ভারতে পাচার করা হয়। এ পন্থায় সোনাও পাচার হয়ে থাকে। বিনিময়ে ভারত থেকে আসে শাড়ী,

www.pathagar.com

প্রসাধনী, মাদক দ্রব্য, এমনকি নকল টাকা। আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের, পরিবারের সদস্যদের, আত্মীয়স্বজনদের, প্রাথমিক শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধব সকলকেই অন্তত ভারতীয় সূতী বস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করে থাকি। আমার পরিবার ও ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন ইতিমধ্যে ভারতীয় সূতী বস্ত্র বর্জন শুরু করেছে। অনেকে প্রশ্ন করেন, বাজারের কাপড় থাকলে আমরা কোন কিনাবোনা? আমার উত্তর হলো, চাহিদা যতদিন থাকবে, ততদিন ২৩ শত মাইল ব্যাপী সীমান্ত দিয়ে কোন প্রকারেই চোরা চালান বন্ধ করা যাবে না। এটা বন্ধ করার একমাত্র পন্থা হলো বাজারে চাহিদা কমানো। সম্ভব হলে ভারতীয় সূতী বস্ত্রের যোগানদারকে সামাজিকভাবে হেয় করা। একবার আমার এক ছাত্রীর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সচেতন ছাত্রী হয়ে, ভারতীয় শাড়ী পরার লোভ সামলাতে পারোনা, আর একজন অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিকে এককালীন দশ হাজার টাকার লোভ সামলাতে বলো কোন যুক্তিতে? আমি তাকে বললাম জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম সব সময় যুক্তিতে চলে না, আবেগ প্রয়োজন হয়। গান্ধী ল্যাঙট পরেই ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছে। আমার ছাত্রী নিঃশ্চুপ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যেসব দ্রব্য আমাদের দেশে প্রস্তুত হয়, সেসব দ্রব্য আমদানী ও চোরা চালানী বন্ধের ব্যাপারে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কিছু না কিছু করণীয় আছে। সামাজিক আন্দোলন না হলে আমাদের অর্থনীতির প্রাণ সঞ্চারিত হবে না।

ইংরেজের সৃষ্ঠ আমলা শ্রেণীর সাধারণ লক্ষ্য হোল, যেকোন ভাবে হোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা। জাতীয়করণের ফলে এক শ্রেণীর আমলারতো পোয়া বারো হয়েছে। এ ব্যবস্থায় "কামধেনু"র মুখ রয়েছে জনগণের ভাণ্ডারে আর বাট রয়েছে প্রশাসনের হাতে। পাইপ লাইনের শোষণে জনগণ শীর্ণ হতে শীর্ণতর হচ্ছে। নানা তন্ত্র মন্ত্রের দোহাই দিয়ে এ শক্তিশালী মহলটি অর্থনীতির এ অদ্ভুত অবস্থা বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শিক্ষিত শ্রেণীকে আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি কর্মকে অবজ্ঞা করতে শিখানো হয়। "বেটা চাষী" কথাটা তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হয়। নিম্নতম ডিগ্রী ধারী ব্যক্তিও যেকোন ভাবে হোক শহরে অনুৎপাদনশীল জনতার সদস্য হওয়াকে জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করে। এর ফলে প্রতিভাবান শিক্ষিত শ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কচ্যুত হয়ে, ভোগকারী শ্রেণীর সদস্য হয়ে পড়ে। উৎপাদন ব্যবস্থার শতকরা নব্বই ভাগ থাকে নিরক্ষর জনতার হাতে। তাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা সনাতনী পদ্ধতি ত্যাগ করে এ যুগের সাথে তাল মিলাতে পারছে না।

শত বৎসরের পুরাতন প্রশাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের বাস্তব কানো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বরং এ ব্যবস্থা সংস্কারের নামে নানা প্রকারের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। প্রশাসনিক সংস্কারের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে আরো কুক্ষিগত করা। রাজনৈতিক স্বার্থে অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করা হয়। তাই এ সংস্কার শক্তিশালী বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি আমাদের কোন কিছুরই অভাব নেই। শুধু সৎ, দক্ষ ও দেশ প্রেমিকে নেতৃত্বের অভাবই আমাদের সকল দারিদ্র ও দুর্দশার কারণ।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশে এমন নেতৃত্ব আসবে, যে নেতৃত্বের দেশের সকল সম্পদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকবে। যে নেতৃত্ব সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে, আমাদের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ, সুখী ও সম্মানিত বাংলাদেশ গড়তে পারবে। যে নেতৃত্ব সততা ও যোগ্যতার মাধ্যমে সারা দেশবাসীকে দেশ গঠনে তেমনি উদ্বুদ্ধ করতে পারবে, যেমনি দেশবাসী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হয়েছিল।

আমরা আপামর দেশবাসীর মতই সেই শুভদিনের অপেক্ষায় আছি।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

www.pathagar.com

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ